ক্যামের দেওয়াল

মিহির সেন

গ্রন্থ-নিলয়

প্রকাশক :
প্রেমময় মজুমদার
৪৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

মুদ্রক
অজিত কুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
বিজয়া দশমী, ১৩৪০

প্রচ্ছদ শিল্পী
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

বেঁধেছেন
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১০ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দিদি, দিদিমণি ও ছুটুকে

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

আলোক লগ্ন

আরো একজন

প্রবেশ নিষেধ (নাটক)

এক

ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে এ-পর্যন্ত সর্বসমেত একশ' তিনটি চাকরির দরখাস্ত-করা স্বপনের দরখাস্ত প্রসঙ্গে একটি দর্শন গড়ে উঠেছিল। প্রথম পঞ্চাশটি পর্যন্ত জীবনে সে আশাবাদী ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই গীতোক্ত 'মা ফলেষু কদাচন' উপদেশ আত্মস্থ করে ক্রমেই সে নির্লিপ্ত হতে শুরু করে। এবং দরখাস্ত সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এযুগে দরখাস্ত প্রেরণ কর্মটি লৌকিক নয়, নির্মল যৌগিক কর্ম। 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ব বুদ্ধিকেই যোগ কহে। কিন্তু এহেন যোগের মাধ্যমে বিষ্ণুপদ বা মোক্ষপদ লাভের পথে হঠাৎ বাদ সাধল একদিন একটি আচমকা নিয়োগপত্র। প্রায় ভুলে যাওয়া একটি ইণ্টারভিউয়ের অকালপক্ক এই ফলটি এসে প্রথম উপলব্ধি করাল স্বপনকে যে, এই লৌকিক পার্থিব জগতের আকর্ষণ ত্যাগ করা অত সহজসাধ্য নয়। শুধু উপলব্ধি করাল নয়, ওর সমস্ত সত্তা জুড়ে যেন একটা ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিল। নিয়োগপত্রটা সামনে মেলে ধরে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেটার দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকল স্বপন তারপর কি যেন অন্যমনস্কে ভাবতে ভাবতে এক সময় দলা পাকিয়ে পাকিয়ে এতটুকু করে সেটা ছুড়ে ফেলল ঘরের কোণে। বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল আবার।

তপন যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে। স্বপনকে এ অবস্থায় দেখে দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। —কিরে, পেইন্‌টা উঠল নাকি আবার মুখ তুলল স্বপন।—না।

—না মানে? কি হয়েছে সত্যি করে বল।

—বললাম তো কিছু না।—মুখ ঘুরিয়ে নেয় স্বপন।

কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে তপন পাশের টেবিল থেকে শিশি আর মেজার গ্লাসটা তুলে নেয়। দেখেই বোঝে স্বপন, দাদা তার কথা একবিন্দু বিশ্বাস করেনি। ব্যথা উঠলে যে ওষুধটা খাবার কথা, সেটা না খাইয়ে ছাড়বে না ও। দাদার এ স্নেহ, সেবায় দাদার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ সে। অন্য সময় হলে হয়তো আবদারী গলায় মৃদু আপত্তি করত শুধু, কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে দাদার এ ব্যবহারটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি মনে হল স্বপনের। হঠাৎ মেজার গ্লাসটা টেনে নিল সে দাদার হাত থেকে। টিপয়ের উপর ঠক করে সেটা রেখে দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, সব সময় ইয়ে ভাল লাগে না। বলছি পেইন্ ওঠেনি।

ভাইয়ের গলার স্বরে অবাক হল তপন। সম্পূর্ণ অপরিচিত এ স্বরের পর্দা ওর কাছে। স্থির দৃষ্টিতে ভাইয়ের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও। বেদনাতুর হয়ে এল দৃষ্টি। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু বলল, ওঃ, আমারই ভুল হয়েছিল। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল তপন ঘর থেকে।

স্বপন চীৎকার করে ডাকল এবার, দাদা!

তপন ঘুরে দাঁড়াল।

—দাদা, সত্যি আমার পেইন্ ওঠেনি। ঐ দেখ।

ফিরে তাকাল তপন আঙুলের নিশানা অনুসরণে। কিন্তু কারণটা কোথায়ও খুঁজে পেলনা। স্বপন নিজেই এবার বিছানা থেকে নেমে কোণ থেকে তুলে আনল দলা পাকান কাগজের টুকরোটা। তপনের হাতে তুলে দিল। আলতো কৌতূহলে কাগজটা খুলতে লাগল তপন। বাঁকা ভুরুতে জিজ্ঞাসা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল স্বপন।

ঠোঁটের কোণে একটা অব্যক্ত প্রতিহিংসার ভাঁজ ফুটে উঠল তপনের কাগজের টুকরোটা পড়তে পড়তে। কিন্তু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিতে নরম হয়ে এল ওর চোখ দুটো। বেচারী! এ যেন মরার পর লটারী জেতার সংবাদ পৌছান। তবু ওকে সান্ত্বনা

দেবার জন্যই বোধহয় তখনি আবার নিজের স্বভাবে ফিরে এল তপন। হেসে স্বপনের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিল।—ইডিএট্! উসমে কেয়া হ্যায় রে! এম-এ পাশ করেছিস, চাকরি কি আর আটকে থাকবে তোর। কত চান্স পাবি এর পর। আগে ভাল হয়ে ওঠ তো।

স্বপন দাদার হাত চেপে ধরল, না দাদা, চাকরিতে জয়েন করব আমি। বরং জয়েন্ করেই কিছুদিনের ছুটি নিয়ে নেব না হয়।

তপন হাত ছাড়িয়ে নিল।—পাগল নাকি! এখনও টানা দু'তিন মাস বিশ্রাম নিতে হবে। ডাক্তারের অর্ডার। পথ্য যা হচ্ছে সে তো বুঝতেই পারছিস। বিনে পয়সার বিশ্রামটা নিতে আটকাচ্ছে কিসে?

স্বপন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আটকাচ্ছে সংসারের কথা ভেবে, তোমার দিকে তাকিয়ে।

তপন হেসে বলল, চোখ বুজে শুয়ে থাক।

ছোট বোন ইতু চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। তপনের হাতে তুলে দিল কাপটা।

তপন বিস্ময়ের ভান করে বলল, আরে, শুধু চা।

ইতু ফিরে তাকাল। —কেন, অন্য দিন সঙ্গে কি থাকে?

—বাজারের থলি। প্রায় বিস্কুটের মতই তো রোজ ওটা চায়ের কাপের সঙ্গে এগিয়ে দিস।

ইতু হাসল, ভয় নেই, আসছে। মা ফুটো সারছে।

তপন চায়ে চুমুক দিল, মা আছে ভাল। ফুটো সারতে সারতেই জীবনটা কাটিয়ে দিল।—তারপর স্বপনের দিকে তাকিয়ে বলল, যা না, আজ তো রবিবার, অমলবাবু ঘরেই আছেন, একহাত দাবাটাবা খেলে আয় না। দাবাটা আয়ত্তে থাকলে জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই মাৎ করে দেওয়া যায় জানিস?

তপনের হাসির পিঠে হাসতে পারলনা স্বপন। গুম মেরে বসে থাকল।

ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে এল তপন। কিন্তু মনটা ভীষণ

খারাপ হয়ে গেল। সংসার প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। বাবার লাইফ ইনসিয়োরেন্সের যে কটা টাকা পেয়েছিল তাও প্রায় শেষ। অথচ নিজের ওর এমন কোন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই যাতে বিরাট একটা কিছু করতে পারে। টুকটাক এটা ওটা ব্যবসা করে কোন রকমে ঠেকা দিয়ে রেখেছে কেবল সংসারটা। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। বিরাট আশা ছিল স্বপনটা পাশ-টাশ করে বেরুলে বোধ হয় কিছুটা সাশ্রয় হবে সংসারের। কিন্তু অল্প খেয়ে বেশি পড়ে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারামটাও যে অমন আয়ত্ত করছে ও, একবারও তা ভাবতে পারেনি। বি-এ পাশের সার্টিফিকেট আর ডাক্তারের এক্স-রে রিপোর্টটা একই দিনে বাড়ি আনল স্বপন। তপনের হাতে তুলে দিল এনে। কাগজ দুটো খুলে দেখল তপন, একটায় ডিস্‌টিংশন আর অন্যটায় ক্যাভিটির ছাপ। অন্যমনস্ক এগোচ্ছিল তপন। রান্নাঘর থেকে মা ডেকে বললেন, তপু, তেল আনতে হবে।

তপন থলিটা নিতে নিতে বলল, কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও।

মা কড়াইয়ে হাতা নাড়তে নাড়তে বললেন, পয়সা দিয়ে যা।

বাকীতে আনাও।- -সামনের দিকে পা বাড়াল তপন।

কলতলায় চায়ের কাপ ধুচ্ছিল ইতু। বয়সে সবার ছোট হলেও বাড়ীতে দাপট ওর সব চেয়ে বেশী। এবং কেউ ওকে পাত্তা না দিলেও ওর ধারণা সংসারটা ওর দৃষ্টি আছে বলেই এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক চলছে। না হলে এত দিনে বাউণ্ডুলে দুই দাদা আর কৃষ্ণভক্ত মার পাল্লায় পড়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটত সংসারের। কলতলা থেকেই গলা চড়িয়ে বলল ইতু, বাকী বললেই হল। ধনু পাল বলে দিয়েছে আর বাকী দেবে না।

ছোট বোনের ধমক খেয়ে আবার নিজের ভেতর ফিরে এল তপন। হাঁসের পালক মনটা আবার ডানা ঝেড়ে উঠে বসল। হেসে বলল, আরে ও ঠাট্টা করে বলেছে। দেবেনা বললেই হল, আগের ধারের ভয় নেই ? বুঝলি ইতু, ধারটা হল ব্লটিং পেপার আর কালির মত। একফোঁটা কোন রকমে ফেলতে পারলেই হল। তারপর

আপ্সেই সেটা ছড়িয়ে পড়বে। ওপাশতলার কালুকে পাঠিয়ে দে শিশি দিয়ে, আমি বলে যাচ্ছি।

রাস্তায় বেরিয়েই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। পাড়ারই ছেলে। তপনকে দাদা বলে ডাকে। রোজই সময় পেলে যাতায়াতের পথে একবার দেখে যায় স্বপনকে। তপনের সঙ্গে দেখা হয় কালেভদ্রে। শুধু মাত্র রাত্রের ঘুমের সময়টুকু ছাড়া তপনের বাড়ীর উপস্থিতি নিয়মিত নয় বলে। তপনদের বাড়ীতেই যাচ্ছিল ডাক্তার।

একটু হেসে জিজ্ঞেস করল তপন, রুগীর হালচাল কেমন বুঝছ বলতো।

ডাক্তার অভয় দিল, ঘাবড়াবার মত কিছু নয়। কিন্তু এবার ওকে একটু চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভাল হত। আচ্ছা, আপাতত ওর জন্য খোলামেলা একটা ঘরের ব্যবস্থা করা যায়না তপুদা?

তপন হেসে বলল, দেখ ডাক্তার, তুমি আমাদের নিজেদের লোক বলেই বলছি, আর কিছুদিন পর হয়তো সবাই মিলেই খোলা আকাশের নিচে ভবঘুরেদের মেলায় গিয়ে বাস করতে হবে। তার আগে আর খোলামেলা ঘর সম্ভব নয়। চেঞ্জের কথাটাও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ।

ডাক্তার একটু ম্লান হল।—অবশ্য এসব কথা চিন্তা করেই এতদিন বলিনি। কিন্তু পাঠাতে পারলে খুবই ভাল হত।

বরং উল্টে তপনই ডাক্তারকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে পিঠ চাপড়ে বলল, ওসব বড় বড় প্ল্যান বাদ দাও ডাক্তার। বিনে পয়সায় যা যা পার বাৎলে দাও। দেখ সব ঠিকমত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ডাক্তার একটু হেসে বলল, বিনে পয়সার একটা স্যানিটরিয়ামের জন্য চেষ্টা করছি। কথাবার্তা এগোলে জানাব।

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তপন, ব্রেভো। তোমার দিকে তাকালে আমাদেরও মাঝে মাঝে রুগী হবার সাধ হয়। চল একটা সিগারেট খাইয়ে দেই।

সিগারেট শেষ করে তপন বাজারের দিকে পা বাড়াল

এতক্ষণ নিয়োগপত্রটার কথা ভাবছিল, চেঞ্জের কথাটা এসে আগের চিন্তাটাকে সরিয়ে দিল। ভাবতে ভাবতে আর পথ চলতে চলতে মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল তপনের। নিজের ওপরই ছোট্ট একটা ধিক্কার এল। অদ্ভুত একটা দেশে জন্মে পড়েছি যাহোক। পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য সব থাকা সত্ত্বেও এমন পড়ে পড়ে মার খাবার কপাল নিয়ে বোধহয় আর কোন দেশে জন্মাতে হয় না। তিন বার কাশলেই কাশ্মীর ছোটে এমন লোকও তো চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এখানে এসে সচেতন হয়ে ওঠে তপন। এবং ঝাঁকি দিয়ে মন থেকে ভাবনাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে। তারপর তৃপ্তিতে মনে মনে হাসে, তবু তো মোক্ষম একখানা পা আছে আমার!

এই পায়ের থিয়োরীটা ওর একান্ত নিজস্ব। নিজস্ব আবিষ্কার নয়, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতিটা। ছেলেবেলায় একটা গল্পে পড়েছিল, একটি লোকের একটি পা ছিলনা বলে দুঃখে মরমে মরে থাকত সে। একদিন এক মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজার কাছে একটি লোক বসে আছে, যার দুটো পা-ই নেই। ওর দিকে তাকিয়ে লোকটি এতদিনে নিজের একটা পা না থাকার সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল।

তপনও জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, কোন অভাব বোধ এসে ওকে আক্রমণ করলেই, যাদের দুটো পা নেই তাদের কথা স্মরণ করে ওর এক পা থাকার তৃপ্তিতে মৌজ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এবং দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় এখন রীতিমত রপ্ত করে ফেলেছে ও পদ্ধতিটা। সুতরাং অচিরেই মনটা হালকা করে হালকা থলের বাজার সেরে গুন গুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যথা সময়ে বাড়ী ফিরে এল তপন।

বাড়ী ফিরে দেখে জাঁকিয়ে বসে গল্প করছে জ্যোতি। জ্যোতি ওদের মামাতো ভাই। বরাবরই বাউণ্ডুলে ধরনের। মা বাবা মারা যাবার পর মাত্রায় সেটা আরো বেড়েছে। মেসে থাকে। কখনও টুকটাক চাকরি, কখনও, টিউশনি করে চালায়। আর যখন চলেনা

অথবা ভাল লাগেনা, তখন মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে একরাশ গল্প নিয়ে।

তপন ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল, কি উষ্ণ প্রস্রবণ, এবার কোন উৎস থেকে ফেরা হল?

জ্যোতি নতুন করে আবার জ্বলে উঠল, ওঃ, এবার একেবারে কানের কাছ দিয়ে ফাড়া কেটে গেছে তপুদা। বাউলদের একটা মেলায় গিয়েছিলাম। ওদের দেখেশুনে প্রায় বিবাগী বাউল হয়ে গিয়েছিলাম আর কি।

তপন বাজারের থলিটা ইতুর হাতে দিয়ে বলল, সংসারের তার হারানিধি ফিরে পাবার সৌভাগ্যের কারণটা কি?

একটু হাসল জ্যোতি।—ঠিক খেয়াল ছিলনা যে বাউলদের মেলার ব্যাপারীরাও বাউল নয়। কিছু বাকী পড়েছিল। শেষের দিকে তাগাদার চোটে চোখে অন্ধকার। হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে টের পেলাম কিছু বাকী-পড়া বাউল রাতের অন্ধকারে মেলা থেকে গোপনে কেটে পড়ছে। আমিও ওদের দলে ভিড়ে কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল দীপেন। স্বপনের বন্ধু। চরিত্রে জ্যোতির ঠিক বিপরীত। ভীষণ মুখচোরা। কিন্তু অল্প যে দু-চারটা কথা বলে তাতেই বোঝা যায় বেশ রসিক। এবং শান্ত হলেও স্থান বিশেষে বেশ দৃপ্ত।

জ্যোতি হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় তারস্বরে পিসিমাকে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। দীপেন একটু হেসে বলল, বাবা, যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

এতক্ষণে দীপেনের দিকে তাকাবার সুযোগ পেল তপন।

—তারপর, তোমার কি খবর? কেমন আছ?

দীপেন একটু হাসল, বেঁচে আছি আর কি।

—কি করছ?

—বেঁচে থাকার চেষ্টা।

তপন হাসল, ভালই। কাজটা অবৈতনিক হলেও সময় কাটে বেশ। কাজ পাও না পাও, কাজ খোঁজার কাজটা সমানে চালিয়ে যাবে বাবা। আরাম হারাম হ্যায়! স্বপন তো শুয়ে শুয়েও চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বপন গম্ভীর হয়ে বলল, কি করব বল, যে ভিখিরিদের পা নেই তারা শুয়ে গড়িয়েই ভিক্ষে করে।

দীপেন উঠে দাঁড়াল, গড়ালেই যদি ভিক্ষে পাওয়া যেত তাহলে সত্যি পা কেটে ফেলতেও রাজী ছিলাম। আচ্ছা চলি আজ। জ্যোতিকে বলে দিস স্বপন।

স্বপন ওর হাত টেনে ধরল, দূর, এখনই কোথায় যাবি, বসনা।

দীপেন বসল না।—না ভাই বসব না। আজ রাত্রের ট্রেনে একটু দার্জিলিং যাচ্ছি। হঠাৎ একটা পাস পেয়ে গেলাম।

দার্জিলিং-এর কথায় তপনের হঠাৎ চেঞ্জের কথাটা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকবে ?

—আমার এক পিসতুতো বোন আছে ওখানে। ওর ওখানেই উঠব।

স্বপন সাবধান করল দীপনকে, খুব সাবধানে যাস। আজকাল নাকি পাস সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি হয়েছে শুনেছি।

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল দীপেন, আরে দূর, সবই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। আমাকে আর কে চিনছে বল, কাগজখানা ঠিক থাকলেই হোল। স্রেফ্ কাগজের রাজত্ব এটা। কাগজ ঠিক থাকলেই সব ঠিক।

কথাটা হঠাৎ মনে দাগ কেটে বসল তপনের। বিরাট একটা ইংগিত হয়ে নড়তে শুরু করল চিন্তায়। একটা সম্ভাবনার আভাস বিচলিত করে তুলল ওকে। কাগজের রাজত্ব! সত্যিইতো গোটা সমাজটাই আজ কাগজের উপর চলছে। কে কার সত্যি পরিচয়ের দাম দিচ্ছে। নিঃশব্দে ওদের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তপন। কথাটা একটু সংগোপনে, এবং সযত্নে ভাবা দরকার।

সেদিন সারাদিন ভাবল তপন। সারারাত। নিজের দিক দিয়ে ভাবল। তারপর স্বপনের দিক থেকে। এবং সর্বশেষে গোটা সংসারের পটভূমিতে। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এল ও, যস্মিন দেশে যদাচার। কাগজের পরিচয়ই যদি সমাজে সত্যি পরিচয়ের চেয়ে দামী হয় তাহলে সেটাকেই কাজে লাগাতে ক্ষতি কি? যদি কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটা একা ওর। তবু মার মুখে হাসি ফুটুক। ইতুর সামনে নতুন ভবিষ্যৎ আসুক। স্বপন সুস্থ হোক। ওর একার চেয়ে তিনটে জীবনের সমবেত দাম অনেক বেশী।

দুই

বিরাট অফিস বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে এমন সাহসী তপনেরও বুক দুরদুর করে উঠল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিহারী দ্বারোয়ান-টির হাতের গুলিদুটো লক্ষ্য করতে লাগল। ধরা পড়লে প্রথম আতিথ্যটা যার কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

ছিমছাম পোষাকে কর্মচারীরা দলেদলে বাড়িটার ভেতর ঢুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। তপনের দিকে ফিরে তাকাবারও সময় নেই কারো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগল তপন। তারপর একসময় টুংটাং একটা শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একটা আখমাড়াই কল। একগোছা তাজা আখ কলটার দাঁতের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে লোকটা। ছিবড়ে হয়ে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আখগুলো। মুহূর্তের জন্য ছিম ছাম কর্মচারীরা ওর কল্পনায় গোছা গোছা আখ হয়ে গেল। গেটটা বিরাট একটা কলের দাঁত। এত ভয়ের ভেতরও মনে মনে কৌতুক অনুভব করল তপন। তারপর অপেক্ষা করা নিরর্থক বুঝে নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে গমকে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। নির্ভীক পদক্ষেপে দ্বারোয়ানটাকে পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিন্তু দু পা এগোতেই হঠাৎ ধীর লয়ের দুটো হাততালির শব্দে থামতে হল তপনের। সভয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দ্বারোয়ান

খৈনি বাটছে। তবু থেমেছে বলেই জিজ্ঞেস করল, কুছ বলতা জী? খৈনীটা ঠোঁটের আশ্রয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল দ্বারোয়ান, নেহি। কিসকো মাঙ্গতা!

—সাহেব কো।

—কৌন সাহাব? সাহাব তিন হ্যায়—ঘোষ, বোস, রাহা।

মনে মনে চিন্তা করে নিল তপন, চাইতেই যদি হয় বড় সাহেবকে চাওয়াই শ্রেয়। প্রবেশ পথ হয়তো সুগম হবে তাতে। বলল, বড় সাহেবকো মাঙ্গতা।

নির্লিপ্তভাবে বলল দ্বারোয়ান, সভ্ ভি বড়া হ্যায়।

একটু বিব্রত বোধ করল তপন। কিছু না ভেবেই বলে ফেলল, জরুর, বড় নাই হোনেসে সাহাব হোগা কেইসে।

বলেই মনে পড়ল পকেটের নিয়োগপত্রটার কথা। তাড়াতাড়ি সেটা টেনে বের করে চোখ বুলিয়ে বলল, মিঃ রাহা।

দ্বারোয়ান ঠোঁটের ফাঁকে খৈনিটাকে জিভ দিয়ে পুনর্বিন্যাস করতে করতে হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, উধার।

ছাড়া পেয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেল তপন দ্রুত পায়ে। তারপর দ্রুততর পায়ে ফিরে এল সেদিকের শেষ সীমায় মেয়েদের একটা ক্যান্টিনের সামনে গিয়ে পড়ায়। এবং তারপর ভয়ে ভয়ে একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে যখন তিনতলার সত্যি গন্তব্যস্থানে পৌঁছাল তপন, অফিস সম্বন্ধে প্রথম পাঠ সমাপ্ত তখন ওর। অজানা ব্যক্তির পক্ষে যে কোন অফিসের গন্তব্যস্থানে পৌঁছানর চেয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছান বোধহয় অনেক সহজ। মিঃ আর, কে, রাহা—নেম্ প্লেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে এটাই হল তপনের প্রথম অভিজ্ঞান।

এবার অভিযানের পালা। একটু অপেক্ষা করেও কোন বেয়ারা না দেখে সাহসে ভর করে নিজেই সুইং ডোরটা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিল তপন এবং অবাক হল। দুটো কোটের হাতা যেন শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে বিরাট একটি সিনেমা পত্রিকা। পত্রিকার প্রচ্ছদে আবক্ষ এক সুন্দরী। পাঠক মহাশয়ের আত্মপরিচয় তাতে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। অবশ্য

তাঁর কর্মাদর্শের বাঁধান পরিচয়টি মাথার পেছনে দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে : আরাম হারাম হ্যায়। বিব্রত তপন কি করবে ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ পত্রিকাখানা টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে অন্তরাল-ব্যক্তি-টিকে প্রকাশ করে দিল। তিনি প্রকাশিত হলেন কুঞ্চিত ভ্রূকুটি নিয়ে। তপন হাত জোর করে নমস্কার করল, মে আই কাম ইন স্যার ?

স্থানচ্যুত ভুরু স্বস্থানে ফিরে এল এবার। অর্থাৎ, ও, ভয় পাবার মত কেউ নয়! বললেন, আসুন, কি দরকার আপনার ?

এগিয়ে এসে নিঃশব্দে নিয়োগপত্রটি এগিয়ে দিল তপন।

সাহেবের ভুরু আবার স্থানচ্যুত হল। রাগতভাবে বললেন, তা সরাসরি অফিসারের ঘরে কেন, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি ? আপনাদের জন্য কি নিরিবিলি একটু কাজ করারও সময় পাবনা আমরা।

—অত্যন্ত দুঃখিত, —তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল তপন। নমস্কার করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারপর খোঁজ করে করে বের করল বড়বাবুকে। বড়বাবু নিয়োগপত্রটা একবার দেখে তপনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আবার সেই সাহেবের ঘরেই।

সাহেব এবার একটু খুসী স্বরে বললেন, আসুন। অফিসের একটা সিসটেম্ আছে তো। মানে—।

—মে আই কাম ইন স্যার ?—নতুন প্রশ্নের উপস্থিতিতে থামতে হল সাহেবের। সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি।

—ইয়েস্, ইয়েস্।—চাপা উৎসাহে ডাকলেন প্রশ্নকর্তাকে। তারপর গাম্ভীর্যের সঙ্গেই একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাটিনি না পেলে সন্ধ্যার শো আনব, স্যার ?

সাহেব একটু বিব্রত হলেন। আলগা ভাবে বললেন, তা আনবেন।

দু পা এগিয়েও আবার থেমে পেছনে তাকালেন ভদ্রলোক, যদি পাশাপাশি দুটো না পাই স্যার ?

উত্তরে সাহেব কটমট করে তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক দ্রুত নমস্কার করে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এবং সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেখুন, অফিসের একটা সিসটেম্ আছে তো।

মাথা চুলকে সমর্থন করল তপন, হ্যাঁ স্যার, সে তো নিশ্চয়ই।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এগিয়ে দিলেন বড়বাবু। সাহেব তপনের দিকে তাকালেন, আপনার সার্টিফিকেটগুলো এনেছেন ?

বুকটা আর একবার ছাৎ করে উঠল তপনের। সন্তর্পণে পকেট থেকে সার্টিফিকেটগুলো বের করে দিল।

সার্টিফিকেটগুলো দেখতে দেখতে একসময় চোখ তুললেন সাহেব। —আপনি এম. এ? তাহ'লে আপনার আবেদনপত্রে শুধু বি. এ. আছে কেন ?

তপন মাথা চুলকে বলল, আবেদন ও গ্রহণের মাঝে তিন বছরের ব্যবধানে ওটাও পাশ করে ফেলেছিলাম। কোন অফিসিয়াল সিস্টেমে বাঁধলে আমি বরং ওটা উইথড্র করে নিচ্ছি স্যার।

হঠাৎ সাহেব আর একটা কাগজ দেখে উৎসাহে সোজা হয়ে বসলেন।—আরে, ফ্রেঞ্চ-এ আপনার একটা ডিপ্লোমাও আছে দেখছি। গুড্। আমিও ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে ভীষণ ইন্টারেস্টেড্।

মুখ শুকিয়ে গেল তপনের। এই সেরেছে। আর সাবজেক্ট পেলেন না ভদ্রলোক, বেছে বেছে ঠিক ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড্ হয়ে বসে আছেন! আর স্বপনটাও তো ছাই অন্য কোন বিষয়ে ডিপ্লোমা নিতে পারত।

তবু এই উৎসাহের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করেই চোখ-নাক বুজে বলে ফেলল তপন, 'এতো আমার সৌভাগ্য স্যার। এসব বিষয়ে উৎসাহী লাখে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হওয়া যাবে।

এবার একটু লাজুক হাসলেন সাহেব।—না, মানে, আমি শুধু বাংলা অনুবাদ মাধ্যমেই উৎসাহী হয়েছি।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল তপনের। সাহেব কাগজ-পত্রগুলো দেখে তপনের দিকে এগিয়ে দিলেন।—তাহলে আজ থেকেই জয়েন্ করুন। বড়বাবুর সঙ্গে যান, উনি সব ঠিক করে দেবেন।

নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল তপন। মনে মনে বিরাট একটা স্বস্তি বোধ করল। কাগজের রাজত্বের প্রথম প্রাচীরটা সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হওয়া গেল তাহলে!

তিন

পরদিন থেকেই দ্বিমুখী জীবন শুরু হল তপনের। বাড়ীতে, পাড়ায়, সমাজে নন্‌ম্যাট্রিক প্রায় বেকার। অফিসে এম. এ., ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

প্রথম কদিন খুবই খারাপ লাগল। ভয়ে ভয়ে কাটাল। ভয়টা অবশ্য বাড়ীর জন্য খুব নয়। কখন যে ও কি নিয়ে কি করছে সঠিক জানেনা কেউ বা জানবার চেষ্টাও করে না। শুধু জানে অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক কিছুই ক'রে এ সংসারের চাকায় তেল জুগিয়ে যাচ্ছে ও। আর, শুধু যে দেহেরই রসদ যোগাচ্ছে তাই নয়, সংসারের প্রাণটাকেও সজীব রেখেছে নিজের প্রাণোচ্ছলতায়। স্বপনের ভাষায়, ওর হাঁসের পালক মনটার দৌলতে। সত্যিই হাঁসের পালক মন তপনের। দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট, গ্লানি, অসাফল্য, অপমান—কোন কিছুই স্থায়ী আঁচড় কাটতে পারেনা ওর মনে। সাময়িক আঘাতগুলো মুহূর্তে ডানা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পূর্ববৎ উচ্ছল হয়ে ওঠে তপন। স্বপন অবাক হয়, এবং ঈর্ষা বোধ করে দাদার এই মনটার দিকে তাকালে।

ইদানিং রোজ সকাল দশটার ভেতর খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেও তাই খুব বেশী মাথা ঘামালনা কেউ ব্যাপারটা নিয়ে। বুঝল তাড়াতাড়ি বেরুনর কোন কাজ পড়ে গিয়েছে ঘাড়ে।

কিন্তু অসুবিধে হল অফিসটা নিয়ে। বাড়ীর চোখগুলোর মত এখানকার চোখগুলো নির্লিপ্ত নয়। কৌতূহলী। অথচ সে কৌতূহলকে আদৌ আমল দিতে চাচ্ছিলনা তপন। বরং আত্মরক্ষার জন্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল। বিরাট একটা গাম্ভীর্যের বর্মে নিজেকে ঢেকে তাই বসে থাকতে হল প্রথম ক'দিন। ওর আড্ডাবাজ আমুদে মনটা হাঁসফাঁস করা সত্বেও।

এতে অবশ্য আত্মরক্ষা হল, কিন্তু সুনাম রক্ষা হল না। টের পেল তপন সহকর্মীদের ভেতর কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। রটে গেছে ভীষণ দাম্ভিক ভদ্রলোক।

দোষ অবশ্য সহকর্মীদেরও নয়। তপন নতুন বলে সৌজন্যবশে তারাই প্রথমে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছে ওর গাম্ভীর্যের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

প্রথম দিন দশের ভেতরেই এ ধরনের কয়েক পশলা আলাপ হয়ে গেল :

পাশের টেবিলের ভদ্রলোক আড়চোখে তপনের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে—কি দাদা, ফাইল থেকে যে ঘাড় তুলছেনই না।

তপন মাথা না তুলে গম্ভীর স্বরে—হাড়িকাঠে পড়লে ঘাড় কি নিজের হেপাজতে থাকে?

—তবু একটু ছটফটও তো করে।

—সেটাও পরিশ্রমের বৃথা অপচয়।

ভদ্রলোক মুখ কালো করে—ও-ও!

ভদ্রলোক সেই যে নিজের ফাইলের দিকে মুখ ফেরালেন সে মুখ আর এ পর্যন্ত তপনের দিকে ফিরল না।

অথবা—

অফিসের সবচেয়ে আমোদী আড্ডাবাজ ছেলেটি কি একটা চিঠির রেফারেন্সের জন্য তপনের কাছে এসে বিনয়ের সঙ্গে—দাদা এর আগে কোথায় ছিলেন?

তপন চিঠিটা দেখতে দেখতে - বাড়ীতে।

ছেলেটি থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে—ও। এই প্রথম কাজ তাহলে?

—প্রথম অফিসের কাজ।—তপন ফাইল ওল্টাতে থাকে।

ছেলেটি একটু থেমে—কোন দিকে থাকেন আপনি?

—নর্থ-এ।

ছেলেটির ধৈর্যে ফাটল দেখা দেয়।—এখান থেকে হিমালয় পর্যন্ত সবটাই তো নর্থ।

তপন বোঝে এবার কিছুটা রাশ আলগা করতে হয়। না হলে হয়তো ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। বলে, শ্যামবাজারে।

ছেলেটি এবার উৎসাহিত হয়।—তাই নাকি? আমিও হেদোর দিকে থাকি। কোন রাস্তা কত নম্বর বলুন তো।

—বারো তুই একষট্টি।

ছেলেটি বিস্মিত হয়।—বাড়ীর নাম্বার বার তুই একষট্টি!

—না, চিঠিটা ঐ তারিখে গিয়েছিল।

চিঠিটা নিয়ে ছেলেটি ছিটকে বেরিয়ে যায়। এবং দূর থেকেই তার দ্রুত আন্দোলিত হাতের মুদ্রা থেকে অনুমান করে তপন সহকর্মী- কাছে সালঙ্কারে ও ওর নতুন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছে এবং তার সবটাই সঠিক তপনের চরিত্র বর্ণনা।

তপন অবশ্য খুব গায়ে মাখল না সেটা, কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্তে এল, আর একটু আলগা হলেও ক্ষতি নেই এখন। এতদিন দূর থেকে নিরীক্ষণ করে সহকর্মীদের মোটামুটি পরিচয় পেয়ে গেছে। এবার পাত্রভেদে ব্যবহারভেদ বজায় রেখে চলতে পারলেই সেরকম ভয়ের কিছু নেই। নাহলে এভাবে চললে অল্প কিছুদিনের ভেতরই একঘরে হয়ে পড়তে হবে। সহকর্মীদের কৌতূহলটা যদি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানে বেরোয় তাহলে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ার ভয় আছে। প্রাথমিক ভয়টা কেটে যাবার পর তাই আস্তে আস্তে রাশ আলগা করতে শুরু করল তপন। এবং নিজের প্রয়োজনেই বিশেষ একজনের সঙ্গে একদিন যেচে গিয়ে আলাপ করতে হল।

তিনি শ্রীকৃষ্ণ হালদার। এ অফিসের ডিলিং ক্লার্ক।

ভদ্রলোকের সঠিক বয়স অনুমান করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব ওঁর বয়স সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে মুখের কয়েকটি ভাঁজ ও ব্রণের দাগ দেখে যৌবনের ক্ষেত পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের আলপথে উঠে দাঁড়িয়েছেন বলেই মনে হয়। অবশ্য পাত্র হিসেবে দেখছে না বলেই ওঁর বয়স নিয়ে মাথা ঘামায়নি তপন। ওঁর গুণগুলো এই কদিন লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছে শুধু। এবং নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে, শ্রীকৃষ্ণবাবুর প্রধান গুণ নিরাসক্তি। সেটা জীবন এবং অফিস দুটো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অফিসের কালি-কলম-ফাইল সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণবাবুর আসক্তির বাইরে। দশটা-পাঁচটা নিজের আসনে বসে থাকা ওর প্রায় যৌগিক আসনের পর্যায়েই পড়ে। কোন্ একটি যৌগিক আসনে যেন সমস্ত মনোযোগ ও দৃষ্টি নাভিতে কেন্দ্রীভূত করে বসে থাকতে হয়। ওঁর মনোযোগ ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে নাভির উপর রক্ষিত সিনেমা পত্রিকায়। সর্বসময়ই কোন না কোন সিনেমা পত্রিকা ওঁর নাভি-বেষ্টিত ধুতির মতই অপরিহার্য।

এবং সমস্ত জ্ঞানী লোকের মতই শ্রীকৃষ্ণবাবু পড়েন বেশী বলেন কম। পারতপক্ষে অফিসের কোন কথাবার্তার ভেতর থাকেন না উনি। কিন্তু একমাত্র একটি ক্ষেত্রে মুখ না খুলে পারেন না। ওঁর সামনে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বয়স, বাসস্থান, বংশপরিচয় বা আনুমানিক পারিশ্রমিক নিয়ে ভুল আলোচনা হতে শুনলে।

ভদ্রলোক প্রসঙ্গে প্রথম থেকেই কিছুটা কৌতূহল ছিল তপনের। কারণ শ্রীকৃষ্ণবাবুই সেই ব্যক্তি যাকে প্রথম দিন সাহেবের জন্য সিনেমার টিকিট কাটতে যেতে দেখেছিল তপন। অবশ্য অন্য একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু ঠিক যুতসই সুযোগ পাচ্ছিলনা।

একদিন সুযোগ জুটে গেল দিনকয়েক পর টিফিনের সময়। সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল টিফিনে। শ্রীকৃষ্ণবাবু উঠি উঠি করেও পত্রিকাটা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। আস্তে তপন এসে পাশে দাঁড়াল। এবং দাঁড়িয়েই রইল।

প্রায় সমাপ্ত রচনাটি শেষ করে সযত্নে বইটা বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে দিলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। যেন পুজোর আসন ছেড়ে উঠলেন। এবং উঠে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে নজর পড়ল তপনের দিকে। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি! কতক্ষণ?

তপন একটু হেসে হাত তুলে নমস্কার করল, একটু আলাপ করতে এলাম।

শ্রীকৃষ্ণবাবু আরো অবাক হলেন, আমার সঙ্গে?

—ঘরে আর কে আছে?

খুশিতে বিগলিত হলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু।—কিন্তু হঠাৎ এদিকে শুভদৃষ্টি?

তপন সহজস্বরেই বলল, শুভদৃষ্টির জন্য শুভলগ্নেরও তো প্রয়োজন।

—তা হঠাৎ এ পাত্রে দৃষ্টি পড়ার কারণ?

হাসল তপন, ধরুন, শুধু অকারণ পুলকে।—তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যি কথা কি জানেন, ঠিক হৈ হৈ করে মিশতে পারি না আমি। আর, সবার সঙ্গেও পারি না।

শ্রীকৃষ্ণবাবু ঠাট্টার স্বরে বললেন, যাক, একটা মুখোস এঁটে থাকেন তাহলে।

তপন হঠাৎ একটু গম্ভীর হল। প্রায় নিজের মনেই বলল, সত্যি মুখখানা দেখানর মত নয় বলে হয়তো।—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। বলল, যাক, ছোট্ট একটা দরকারও ছিল আপনার সঙ্গে। বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করে বলতে পারি কথাটা?

শ্রীকৃষ্ণবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, অবশ্যই, বলবেন না কেন?

একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল তপন, আচ্ছা, পুলিশ ভেরিফিকেসনের ফাইলটাতো আপনিই ডিল্ করেন, না?

— কেন বলুন তো?

—আমার ভেরিফিকেসন্‌টা একটু চেপে দিতে পারলে ভাল হত মানে, এই কিছুদিনের জন্য আর কি।

ছোট্ট একটা সন্দেহের দৃষ্টি ফুটল শ্রীকৃষ্ণবাবুর চোখে।
—কমিউনিষ্ট-টিষ্ট নাকি ?

জিভ কাটল তপন।—উর্ধ্বতন সাতপুরুষ কেউ রাজনীতি করে নি দাদা, নিম্নতম সাতপুরুষও করবে না কথা দিতে পারি।

—তাহলে কোন পুলিস কেস-টেস ?

তপন বুঝল কিছু একটা কারণ না দর্শালে খুশী করা যাবেনা। একটু মাথা চুলকে বলল তাই, এই সামান্য একটা ফল্‌স পেটি কেস্‌, মানে—

—কি কেস্‌? চুরি-বাটপারি নয় তো ?

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল তপন, না, না।

—মারপিট ?

হাসল তপন। —এই শরীরে ?

শ্রীকৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তপনের চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পাঠ করবার চেষ্টা করলেন। তারপর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি বলুন তো দাদা যা সন্দেহ করছি তাই ?

তপন কিছু না বুঝেও, নিছক নিষ্কৃতি পাবার জন্য হাঁ ও নার মাঝামাঝি ধরনের মাথা নেড়ে দিল।

শ্রীকৃষ্ণবাবু উৎসাহের প্রাবল্যে তপনের হাত চেপে ধরলেন, তাই বলুন। বাবা, জহুরি জহর চেনে। আমার প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়েছিল। যাক, তাহলে আপনি রসিক পুরুষ দেখছি।

তপন রসের ব্যাপারটা আদৌ না বুঝলেও একটু হেসে বলল, এই আর কি। তাহলে ঐ কথাই থাকল, আমার ভেরিফিকেসন্‌টা—

শ্রীকৃষ্ণবাবু অভয় দিলেন, না দাদা, সরকারী অফিসের মত ওসব ঝামেলা এখানে খুব একটা নেই। নেহাৎ কেউ অভিযোগ করলে অন্য কথা। তবে টের্‌ যখন পেয়েছি সেই মেয়েটির কথা না শোনা পর্যন্ত কিন্তু ছাড়ছি না দাদা।

আকাশ থেকে পড়ল তপন, মেয়ে! কোন মেয়ে ?

শ্রীকৃষ্ণবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে হাসলেন, কেন ন্যাকামি করছেন। যে মেয়েটির জন্য কেসে আটকে পড়েছেন সেই তিনি।

তপন হো হো করে হেসে উঠল, ওঃ, তাই বলুন। আচ্ছা সে হবেখন।

তৃপ্তির সঙ্গে নিজের চেয়ারে ফিরে এল তপন। পুলিশ প্রসঙ্গে একটা বড় আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেল। এমনি স্বাভাবিক সুস্থ লোককেই বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, ওর ক্ষেত্রে বোধহয় ছোঁয়ারও প্রয়োজন হত না, নিছক দর্শনেই প্রাণান্ত হতে হত।

অবশ্য আর একদিক দিয়েও তৃপ্তি অনুভব করল। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কটা কিছুটা সহজ করে আনবে ভাবছিল, শ্রীকৃষ্ণবাবুকে দিয়েই পরিকল্পনাটার উদ্বোধন করা গেল।

তপন জানত না আর একজনও তখন আবাহন নিয়ে অন্তরালে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। মিস্ মন্দিরা মিত্র।

মিস্ মিত্র এ সেক্শনের স্টেনো এবং একমাত্র মহিলা কর্মী। স্বভাবতই সবার আলোচনারও লক্ষ্যস্থল। এ কদিনেই টের পেয়েছিল তপন, অফিসের আর কাউকে সে রকম পাত্তা দেয় না মিস্ মিত্র। সম্ভবত মিঃ রাহা ওর পাত্তা প্রসঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহী বলেই। নিজের ছোট্ট পার্টিসন-ঘেরা ঘর থেকে মিঃ রাহার চেম্বার পর্যন্ত পথটুকুই মাত্র মিস্ মিত্রর দৈনন্দিন উপস্থিতির সঙ্গে পরিচিত। আলাপের সুযোগ নেই বলেই বোধ হয় ওর প্রসঙ্গে আলোচনার উত্তাপটা একটু বেশী। সে-উত্তাপে মিস্ মিত্রর বয়স, বেশবাস, মিঃ রাহার সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্ক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কুষ্ঠি-ঠিকুজি পর্যন্ত সব কিছুই টগবগ করে ফোটে।

নিজের ঘর থেকে এতক্ষণ তপনকে শ্রীকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে দেখে অবাক হচ্ছিল মিস্ মিত্র। তপনের অসামাজিক পরিচয়টা পার্টিশনের ওপারে বসেও এ কদিনে টের পেয়েছিল। কিছুটা দেখে কিছুটা সহকর্মীদের উচ্চ আলোচনা শুনে।

তপনের জন্য অপেক্ষা করছিল অফিসিয়াল একটা কাজের

জন্যই। তপনকে স্বস্থানে ফিরতে দেখে উঠে দাঁড়াল এবার মিস্। হাত দিয়ে আর একবার খোঁপাটার স্থাপত্য ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। চোখ বুলিয়ে নিল আস্থাণ্ডেল ব্লাউজের গলাটা পর্যন্ত। যেখানে যেটুকু কাপড় থাকা বা না থাকা উচিত ঠিকই আছে তা। তারপর বেশ ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে তপনের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাতের ড্রাফ্‌টটা এগিয়ে দিল তপনের দিকে।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম মিঃ গুপ্ত।

মনে মনে এই মেয়েটি সম্বন্ধে একটু ভয় ছিল তপনের। বিশেষ আলাপ না থাকলেও সাহেবের ঘরে একাধিকবার মুখোমুখি হয়েছে ওরা। এবং মনে হয়েছে, তপন সম্বন্ধে আশানুরূপ নির্লিপ্ত নয় মিস্। মিঃ রাহার তপনের প্রতি সুনজর লক্ষ্য করে না অন্য কোন কারণে ঠিক বুঝত না তপন। অবশ্য জুতসই কোন উপলক্ষ্য না থাকায় ভাল করে আলাপের সুযোগ হয়নি এতদিন। চিঠিটা দেখে বুঝল, আজ সুযোগ ও নিজের হাতে করে নিয়ে এসেছে।

নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল তাই—নিরুপায় হলে করুন।

জবাব এবং বাচনভঙ্গী কিছুটা অপ্রত্যাশিত বলেই বোধ হয় প্রথমেই ছোট্ট একটা হোঁচট খেল মিস্ মিত্র। অবশ্য সামলে নিল তখনই। চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা আপনার ড্রাফ্‌ট তো? ঠিক ফলো করতে পারছি না। একটু পড়ে দেবেন?

তপন চিঠিটা নিতে নিতে বলল, কাউকে.কাউকে ফলো করা মাঝে মাঝে একটু কষ্টকর হয়ে উঠে অবশ্য। কোন জায়গাটা বলুনতো?

মিস্ মিত্র খোঁপায় হাত বুলিয়ে বলল, সবটাই। কেমন যেন একটু প্যাঁচান মনে হচ্ছে লেখাটা।

একটু হাসল তপন, গোটা প্যাঁচটাই খুলে দিতে হবে? দিন।

ড্রাফ্‌টটা পড়তে শুরু করল তপন। এবং না তাকিয়েও টের পেল, আরো কাছে সরে এসেছে মিস্। খোঁপাটা আর একবার ঠিক করে নিয়েছে বাঁ হাতে। পড়া শেষ হতেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল মিস্, চমৎকার উচ্চারণ তো আপনার। সত্যি এত ভাল উচ্চারণ খুব কম

শুনেছি। সাহেবও সেদিন আপনার ইংরেজীর খুব প্রশংসা করেছিলেন।

একটু হাসল তপন।—ওটা সাহেবী বিষয়। যেটা আপনার ভেতরও কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছে দেখছি।

কথাটার সঠিক ইংগিত বুঝতে পারলনা মিস্ মিত্র। তবু একটু বাঁকা মনে হওয়ায় তখনকার মত নমস্কার করে সরে গেল।

ও সরে যেতেই ঝড়ের বেগে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর আবির্ভাব।—ও কি বলছিল ?

—একটা ড্রাফ্‌ট পড়িয়ে নিতে এসেছিল।

আশ্বস্ত হলেন শ্রীকৃষ্ণ হালদার।—তাই বলুন। কিন্তু সাবধান, ও মেয়ের পাল্লায় পড়লে কিন্তু পেটি কেস্-টেস নয়। একেবারে হাইকোর্টের মুখ দেখিয়ে ছাড়বে। সাংঘাতিক মেয়ে বাবা।

কৌতূহলী চোখে তাকাল তপন। —আপনার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি ?

—পাগল নাকি, দেমাকে মাটিতে পা পড়লে তো মেয়ের! অথচ করেন তো টাইপ খট্ খট্। স্টেনো না হাতী; লংহ্যাণ্ডই নিতে পারেনা ভাল করে। নেহাৎ সাহেবের ছোট গিন্নীর কি যেন হন তাই।

শ্রীকৃষ্ণের আসল ব্যথাটা বুঝতে পারে তপন। তবু নিরুৎসাহ না করে বলল, বলে ভালই করলেন। সাবধান থাকা যাবে।

বিগলিত হাসি হাসলেন শ্রীকৃষ্ণ।—হেঃ হেঃ, আপনাকে বলব না ? আপনার সঙ্গে এর ভেতরই কেমন যেন একটা ইয়ে সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। যাকগে, সেই মেয়েটির গল্প একদিন শোনাচ্ছেন কিন্তু দাদা।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু চলে গেলে ড্রয়ারে চাবি দিতে দিতে নিজের মনেই হাসল তপন। রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন চরিত্রের আগমন হচ্ছে। শেষ অঙ্কে গিয়ে কি দাঁড়াবে কে জানে। কথাটা বোধহয় সেক্সপিয়ারের, লাইফ ইজ এ টেল্ টোল্ড বাই এ ফুল!

ফুল কিনা জানে না, তবে সেই অলক্ষ্য নাট্যকারটি বেশ কৌতুক-প্রিয়। প্রথম ভয়টা কয়েকদিনের ভেতরই কেটে যাবার পর সমস্ত

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কেমন যেন একটা কৌতুক অনুভব করছিল তপন। খেলা-খেলা মনে হচ্ছিল। লুকোচুরি খেলা অথবা ধাঁধাঁর খেলা। ভাগ্য আড়াল থেকে নতুন নতুন ধাঁধাঁ এগিয়ে দিচ্ছে আর হাসতে হাসতে সেগুলোর সমাধান করে ফিরিয়ে দিচ্ছে ও।

কিন্তু জানত না তপন, সেই ভাগ্য-দেবতা আড়ালে থাকেন বলেই তাঁর অনেক কৌতুক অলক্ষ্যেই ঘটে যায়। না জানিয়েও নতুন ধাঁধাঁ তৈরী করে রাখেন তিনি। না হলে হয়তো তপন জানতে পারত আজ জ্যোতি ওর এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য এ অফিসে এসেছিল। তার কাছ থেকে অফিসে নবাগত মিঃ এম. এ-এর গল্প শুনে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখতে চেয়ে যাকে দেখছিল, তাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল জ্যোতি। বিস্ময়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের অভিযোগের প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারে নি মিঃ এম, এ-এর স্বার্থের কথা ভেবে। নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে অফিস থেকে সরে পড়েছিল জ্যোতি।

চার

প্রতীক হিসেবে যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে চিনুকেও বোধ হয় সেই পাহাড়ী গাছ বলা চলে, কঠিন পাথর থেকে যারা রস সংগ্রহ করে দিব্যি আরামে বেঁচে থাকে। বাবাকে ওর মনে পড়ে না। মার মুখটা চোখ বুজে স্মৃতির তলা হাতড়ে দেখলে আবছা আবছা মনে পড়ে। আপন ভাই-বোনেরও কোন বালাই নেই। চিনুর ভাষায়, ছেলে হয়ে জন্মালেই এক বাক্যে বলা চলত মুক্তপুরুষ। ছেলেবেলা থেকে লালিত-পালিত জ্যাঠামশায়ের কাছে। বিজয়বাবু অবশ্য সহজ সম্পর্কিতদের কাছে ঠাট্টা করে বলেন, মেয়েটা লালিতপালিত এবং গালিত আমার সংসারেই। প্রথম দুটোর দায়িত্ব আংশিক ভাবে আমিও বহন করেছিলাম। কিন্তু পরেরটার পুরো দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করেছেন ওর জেঠিমা।

অবশ্য জেঠিমার গালাগালটা আদৌ গায়ে মাখে না চিনু। ভরা বর্ষার ছাতিহীন সংসারের বৃষ্টিকে আমল না দেওয়া বৌ-ঝিদের মতই ওর ভেতরই সারা দিনের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। বর্ষণটা মাঝে মাঝে বাঁধা সুরের আবহ সংগীতের কাজ করে বলে মনে হয়। বরং ওটা বন্ধ হলেই কেমন অস্বস্তি লাগে। জেঠিমা একদিন আছাড় খেয়ে সারাদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, (জীবনে ঐ একদিনই), সেই নিগাল গুমোট দিনটার স্মৃতি এখনও মনে আছে চিনুর। বিজয়বাবুও সারাদিন কেমন দুঃখী দুঃখী মুখে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। যতদূর মনে হয় চিনুর, জ্যাঠামশায়ের দুঃখটা স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য নয়। আজীবনের বাঁধা রুটিনে একটা বেখাপ্পা ছেদ পড়ার জন্যই। বিজয়বাবুও অনেক সময় গোপনে হেসে বলতেন চিনুকে, দুম্‌দাম্‌ শব্দে অভ্যস্ত কারখানার শ্রমিকদের মত হয়ে গেছি আমরা। শব্দটা থেমে গেলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি কোন কলকব্জা বন্ধ হয়ে গেছে ভেবে।

এ সংসারে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গেই বোধ হয় ভাবটা চিনুর সবচেয়ে বেশী। নিগ্রহের জোয়ালে ঘাড় দিয়ে ভারটা দুজনে সমান অংশে ভাগ করে নিয়েছে বলে। বরং চিনু দরিদ্র প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক জ্যাঠামশায়টিকে অনেক সময় নিজের পিঠ দিয়েও আগলে চলার চেষ্টা করে।

বিজয়বাবু মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হন। মেয়েটার মনটা যেন কচুপাতা। দুঃখ দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগ সব কিছুই মুহূর্তে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। ও যেমন সবুজ তেমন সবুজ। তপনের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পান। ও ছেলেটার মনও যেন হাঁসের পালক। ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন তো। সুদিনেও দেখেছেন, হঠাৎ বাবা মারা যাবার পর চরম দুর্দিনেও দেখছেন। আর দেখে দেখে অবাক হচ্ছেন।

চিনু আর তপনের কথা এক সঙ্গে মনে এলেই অনেকগুলো আবছা এলোমেলো চিন্তা মাথায় এসে নড়তে শুরু করে বিজয়বাবুর। অনেকগুলো সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা ও সমস্যা একসঙ্গে জট পাকিয়ে

যায়। শেষ পর্যন্ত তাই সঠিক কিছু আর ভাবেন না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। দেশটা দুভাগ হল কিন্তু আমাদের শতভাগ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেল। এখন শুধু বিছিন্ন অংশগুলো দুঃখের ভেলায় কোন মতে তুলে নিয়ে অনির্দিষ্ট ভেসে চলা।

চিনু অবশ্য এত গভীরভাবে ভাবেনা এসব। সময় বা ধৈর্য, দুটোরই অভাব বলে। ও জানে, সিনেমার মত ঘটনার পর ঘটনা জীবনে ঘটে যাবেই। মানুষ তাকে বাধা-টাধা দিতে পারে না। তাই সুখ-দুঃখের সব ঘটনা সম্বন্ধেই ওর একই মনোভাব—ঘটলেই বা কি করার আছে।

বরং আরো অনেক কিছু করার আছে ওর। সকাল থেকে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সংসার করা। জ্যাঠতুতো ভাই বোনগুলোকে দেখাশুনা করা। এটা ওটা সেটা দিয়ে ওদের পুতুল বানিয়ে দেওয়া, গল্প করা। জ্যাঠামণির সব দিকে নজর রাখা। গোটা সংসারটাকে জেঠিমার প্রতাপের উত্তাপ থেকে আগলে চলা। এবং ওরই ভেতর জেঠিমাকে ফাঁকি দিয়ে পাড়া টহল দেওয়া। আর রোজ দুপুরে যেটুকু সময়ের জন্যই হোক হরিহর-আত্মা ইতুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে আসা।

দিনকয়েক আড্ডা মারতে এসে লক্ষ্য করছিল চিনু, তপনদার কোন পাত্তা নেই। সাধারণত দুপুরের দিকে খেতে আসে তপনদা। খেয়ে কিছুটা গড়িয়ে নেয়। তারপর আবার ওর হরেক রকম কাজের স্রোতে ভেসে পড়ে। তারপর কূলে উঠতে রাত বারটা-একটা। খাটতেও পারে বটে।

কিন্তু তপনদা প্রসঙ্গে কিছু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও পারে না ইতুকে। বোঝে না কেন, কিন্তু কোথায় যেন বাঁধে। ইতুর হাতে নতুন করে ঠাট্টার সুযোগ এগিয়ে দিতে চায় না। বোঝে ঠাট্টা, তবু ঠাট্টাগুলোর ভেতর কেমন একটা আলতো লোভ আছে যেন। চিন্তাগুলো নিয়ে পুতুল খেলতে শুরু করে মন।

ছাদের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেঁতুল-মাখা খাচ্ছিল ইতু আর চিনু। আর, ঝাল-ঝাল টক-টক স্বাদ, এমন একটা প্রসঙ্গ আলোচনা করছিল রোদে পিঠ দিয়ে। সে প্রসঙ্গর মাঝখানেই হঠাৎ মনে পড়ল ইতুর চিনুর ইণ্টারভিউয়ের কথাটা।

—এই, সেই পার্টি কোন খবর দেয় নি এখনো ?

—কোন পার্টি ?

—সেই সেদিন যারা দেখে গেল।

একটু হাসল চিনু।—জীবনের এই একটি ক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণম্। পছন্দ না হলেই বাঁচি বাবা।

—কেন ?

মুখ বিকৃত করে মাথার উপর আঙ্গুল দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকল চিনু, আঘাড় বিস্তৃত টাক।

ইতু চোখ ঘুরিয়ে বলল, ও, তাহলে তোর পছন্দ হয় নি বল। ওতো টাকার লক্ষণ রে।

—ভদ্রলোকের অগুন্তি টাকা আছে কিনা জানি না, তবে অগুন্তি বয়সের মালিক ভদ্রলোক।

ইতু একটু চুপ করে থেকে বলল, কেন, জ্যাঠামশাই আগে পাত্র দেখেন নি ?

—দেখলেও জেঠিমা ছাড়বার পাত্রী নন। ঘাড় থেকে নামাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

ইতু হাসল, নেমে গেলেই তো পারিস।

ঠোঁট উল্টাল চিনু।—বয়ে গেছে, বেশ তো আছি।

ইতুর ঠোঁটে একটা কৌতুকের হাসি ফোটে। মুখটা ওর কানের কাছে এনে প্রায় ফিসফিস করে বলে, নেমে আসবি ? চেষ্টা করব ?

ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয় চিনু।—তুই একটা যাচ্ছেতাই।

ইতু মিটি মিটি হাসে।—দাঁড়া তো, দাদাদের সেরকম একটা সুবিধা-টুবিধা হ'ক না, দেখিয়ে দেব মাত্রাজ্ঞান আছে কিনা।

চিনু ওকে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই সরে যায় ইতু। তেঁতুল-শেষ আঙুলটা চুষে বলে, দাঁড়া, একটু আচার নিয়ে আসি। ঠিক জমল না।

জ্যোতি কদিন থেকেই একটু আড়ালে খুঁজছিল তপনকে। প্রথমে একবার ভেবেছিল, যাকগে, ও প্রসঙ্গ তুলে তপনদাকে অস্বস্তিতে ফেলা উচিত হবে না। কিন্তু আরো গভীরভাবে চিন্তা করার পর ও সিদ্ধান্ত বদলাল। অবশ্যম্ভাবী না হলে এরকম একটা বিপদজনক খেলায় নিশ্চয়ই নামত না তপনদা। এ সময় মাথা ঠাণ্ডা-থাকা অন্তত একজন শুভার্থীও ওর পাশে থাকা উচিত। সেদিক দিয়ে নিজের মত যোগ্য পাত্র আর চোখে পড়ল না জ্যোতির। সুযোগটা এতদিন পর আজ হাতে এল ওর।

কে একজন মহানুভব ব্যক্তি, যিনি তাঁর মৃত্যু দিয়ে কর্মচারীদের শেষ (এবং সম্ভবত একমাত্র) উপকার করে যাবার শক্তি রাখেন, মারা গিয়েছিলেন। অফিস কিছুটা আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল তাই। তপন এসে দেখল ওর বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে কোথেকে টেনে বের করা একখানি 'কর্মযোগ' পড়ছে জ্যোতি। বোধহয় মা-র বাক্স থেকে।

তপন স্যাণ্ডেল খুলতে খুলতে হেসে বলল, ও পদার্থটি তো জীবনে কোনদিনই যোগ হবে না, মিথ্যে কেন পড়ে সময় নষ্ট করছিস।

ওকে দেখে উঠে বসল জ্যোতি। হেসে বলল, অলসদের উপদেশ দেবার জন্য। অবশ্য তুমি তার ভেতর পড়ছ না তুমি অহোরাত্র কাজের উপরই আছ বলে।—তারপর একটু থেমে তপনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে হঠাৎ গভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে বসল জ্যোতি, তুমি এখন কি করছ তপুদা ?

তপন একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, এটা-ওটা অনেক কিছু। কেন বলতো।

গলা নামিয়ে খুব আস্তে অথচ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলল জ্যোতি, একটা কথা বলব তপুদা, কিছু মনে করবে না ?

ওর বলার ভঙ্গীতে তপনও সামান্য গম্ভীর হল। বলল,, মনে করার কি আছে, বল না।

—তুমি বর্তমানে কি করছ আমি জানি। ঐ অফিসেই আমার এক বন্ধু কাজ করে। হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম একদিন।

ম্লান হয়ে গেল তপন। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর আস্তে জ্যোতির সামনে এগিয়ে।—তাহলে ব্যাপারটা তো সব শুনেই এসেছিস। এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না জ্যোতি। আজকের বাজারে মানুষের চেয়ে কাগজের সার্টিফিকেটের দামই বেশী, সেই ভরসাতে স্বপনের সার্টিফিকেটগুলো কাজে লাগালাম। অবশ্য এল-ডি ক্লার্কের করণীয় কাজটুকু কোন মতে চালিয়ে নিতে পারব, সে ভরসা নিজের উপর ছিল।

জ্যোতি একটু চিন্তা করে বলল, অবশ্য তার চেয়েও বেশী আস্থা তোমার ওপর আমাদের আছে। কিন্তু ঝুঁকিটা একটু বেশী নেওয়া হয়ে গেল না।

ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকাল তপন।—বিশ্বাস কর, এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না ভাই। বাবা অকালে মারা গেলেন। পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে সেই থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়েছিলাম। কোনমতে টেনেও আসছিলাম। কিন্তু এতবড় সংকটে এর আগে কোনদিন পড়তে হয় নি। সমস্ত কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করছিলাম স্বপনের দিকে তাকিয়ে। ভেবেছিলাম ওকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই আবার বিশ্রামের পালা। কিন্তু এমনই কপাল—থাকগে ও সব কথা। এখন সবচেয়ে বড় কথা যেমন করে হোক ওকে ভাল করে তুলতেই হবে। ইতুর বিয়ে দিতে হবে। সংসার চালিয়ে যেতে হবে। আমি একা কিছুতেই আর পারছি না জ্যোতি!

উত্তেজনায় একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়ল তপন। জ্যোতি আবার নিজের ভেতর ফিরে এল। ওকে উৎসাহ দিয়ে সহজ সুরে বলল, যাকগে, ভালই করেছ। চাকরি পাওয়াটাই সমস্যা। ছাড়াটা তো নিজের হাতে আছেই। একটু

সজাগ থেক, তাহলেই হবে। তা, তোমার চাকরির কথাটা বাড়ীতে কেউ—

দরজায় সামনে ইতুকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল জ্যোতি। তপনও উঠে দাঁড়াল, তুই বস জ্যোতি আমি আসছি।

আলনা থেকে লুঙ্গীটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল তপন। ইতু এসে জ্যোতির সামনে দাঁড়াল। জ্যোতি বুঝল, ঠিক জায়গায় ব্রেক কষতে পারেনি তখন। কথাটা শুনেছে ইতু।

ইতু কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করল, দাদার চাকরির কথা কি বলছিলে জ্যোতিদা।

জ্যোতি তরল স্বরে বলল, যুবকদের মুখে তো এখন ঐ একই নামগান। সবাই সমবেত কণ্ঠে ঐ একই কাম-ধূন গাইছে।

ইতু ভুরু কোঁচকাল, কি একটা কথা যেন তোমরা লুকিয়ে যাচ্ছ জ্যোতিদা।

জ্যোতি হাসল, নির্লিপ্ত স্বরে বলল, এই দেখ, এতে লুকানোর কি আছে। তপুদা হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেল কিনা, সেই কথাই হচ্ছিল।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জ্যোতি, স্বপন বারান্দায়, না? দাঁড়া, একটু আড্ডা মেরে আসি।

ইতু জ্যোতির জামা টেনে ধরে, কি চাকরি, কোথায়, বল না বাবা!

জ্যোতি জামা ছাড়িয়ে বেরিয়েযেতে যেতে বলল, আয়তো বলছি। একেবারে আলুথালু হয়ে গেলি যেন কথাটা শুনে। এই জন্যই তোদের মেয়েছেলে বলে, বুঝলি।

বড়শি-গাঁথা মাছের মত জ্যোতির পিছে পিছে বেরিয়ে যায় ইতু।

একটু বাদে তপন ফিরে এসে দেখে ঘর খালি। সামান্য চিন্তিত হয়। ইতু শুনেছে কিনা কথাটা কে জানে। জ্যোতির ওপর বিরক্ত হয়, আলোচনাটা তো জ্যোতি বাইরে কোথায়ও করতে পারত।

—খাওয়াটা পাওনা রইল।

চমকে ফিরে তাকাল তপন। দুষ্টু হাসি নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে চিনু।

একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল তপন, কিসের খাওয়া।

—তোমার চাকরির।

তপন সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, চাকরির কথা তোমাকে কে বলল ?

চিনু হাসল, যেই বলুক, মিথ্যে বলে নি তো। সব শুনেছি মশায়।

ইতুর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চিনু। নতুন করে আর একটা ঠাট্টার সুযোগ ইতুর হাতে তুলে দিতে রাজী নয় ও।

তপন যতটা অবাক হল আতঙ্কিত হল তার চেয়েও বেশী। যে কোন গোপন খবর কোন মহিলার জানা মানে গোটা মহল্লা জানা। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারে নি তপন।

পরম নির্লিপ্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল জ্যোতি। খাওয়ার মত আর কিছু না পেয়ে চিনুর হাত থেকে কিছুটা আচার সংগ্রহ করে তাই পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল জ্যোতি! উত্তেজিতভাবে ওর সামনে এগিয়ে এল তপন।

—সর্বনাশ হয়েছে।

—কেন ?

চিনু যেন কোত্থেকে টের পেয়ে গেছে চাকরির কথাটা।

আচার খেতে খেতে নিরাসক্ত স্বরে বলল জ্যোতি, ইতুর কাছে শুনেছে বোধহয়।

অবাক হল তপন।—ইতুই বা জানবে কি করে।

আঙ্গুলটা দুবার চাটল জ্যোতি।—আমিই বলেছি, না বলে উপায় ছিল না।

হঠাৎ যেন খেপে গেল তপন, ইডিয়েট্। কদ্দুর কি বলেছিস শুনি।

তপনের দিকে উচ্ছল চোখজোড়া তুলে মিষ্টি হাসল জ্যোতি। —বেশী দূর নয়। একটা বইয়ের দোকানে মাস তিনেকের জন্য একটা চাকরি পেয়েছ এই পর্যন্ত। কাজটাও তেমন কিছু নয় বলে তুমি কাউকে কিছু বলনি, ইত্যাদি।

তপন হেসে ফেলল, যা, ইডিয়েট্টা ইউথড্র করে নিলাম। খুব

ভাল করেছিস। অফিসের কাজ বাদে আর সব কাজকেই লোকে এলে-বেলে বলে ভাবে। কেউ আর সেরকম উৎসাহ দেখাবে না আর। বরং আর একটা লাভ হল। রোজ সকাল সকাল খেয়ে বেরুতে দেখে মা একদিন জিজ্ঞেসও করেছিল, আজকাল রোজ এত সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে যাস কোথায়? কোন জুতসই অজুহাত হাতড়ে পাচ্ছিলাম না এতদিন। নাঃ, তোর বুদ্ধি আছে।

জ্যোতি রুমালে হাত মুছতে মুছতে গম্ভীর স্বরে বলল, কিন্তু সিগারেট নেই।

তপন হেসে বলল, দিচ্ছি।

পাঁচ

—হ্যাঁ, এবার লেখ, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে

কানু ব্যাজার মুখে শ্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে শুরু করল। আর মনে মনে হিংসে ক তে লাগল বাবার সেই সব অপরিচিত ছাত্রদের, যারা আজ পড়বেনা বলে বাবার এই অসময়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন এবং গলির মুখে কানুকে সংগ্রহ।

কলে জল এলেও নিভাদেবী এসময়ে কোনদিনই ওঠেন না।

ছাত্রবাড়ীর চা-টা আজ হচ্ছে না বলে নেহাৎ ভয়ে ভয়ে বিজয়বাবু এককাপ চা চাওয়াতেই নিভাদেবীর একটু আগে উঠতে হয়েছিল। স্বভাবতই মেজাজটাও সেই সঙ্গে উঠে পড়েছে। চোখে-মুখে বাড়তি খাটনির বিরক্তি ও হাতে চায়ের কাপ নিয়ে নিভাদেবী বিজয়বাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—নাও হয়েছে, ঐ ছাই পাস মিথ্যে কথাগুলো না শেখালেও হবে ছেলেটাকে। ওদিকে কতদূর কি হল?

স্ত্রীকে জীবনে কিছুই দিতে পারেন নি বিজয়বাবু। একমাত্র জিভের ও চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতা ছাড়া। নিজের আদর্শ সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকা পর্যন্ত বিজয়বাবুও স্ত্রীর এই বিরোধী পক্ষীয়

বাক্যবাণ সরকারী ঔদাসীন্যেই চোখবুজে শুনে যেতেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বছরগুলোর বিনিময়ে প্রাপ্ত শূন্যের অঙ্কটা সম্বন্ধে যেদিন থেকে নিঃসন্দেহ হলেন, সেদিন থেকেই ঔদাসীন্য পরিবর্তিত হল শঙ্কায়। এখন যে কোন শক্তিহীন শতছিদ্র সরকার পক্ষীয়ের মতই স্ত্রীর প্রতিটি অভিযোগের আভাসে ত্রস্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

নিভাদেবীর প্রশ্নের সাবমর্ম উপলব্ধি না করেই তাই জবাব দিয়ে দিলেন বিজয়বাবু, ও হ্যাঁ, কাল দেখা হয়েছিল, মানে, ঐ হলধরবাবুর ছেলের সঙ্গে। বাবাকে বলে দেবে বলেছে। মাত্র তো দুমাসের ভাড়া বাকী। ও দিয়ে দিলেই হবে।

—সেকথা কে বলছে?—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন নিভাদেবী। —বলছিলাম চিনুর সেই সম্বন্ধের কথাটা। প্রস্তাব করেছ?

—ও হ্যাঁ কালকেই করব।—বিজয়বাবু কথা দিয়ে দেন। তারপর একটু আমতা আমতা করে বলেন, তা পাত্রের শুনছিলাম তৃতীয় পক্ষ, অবশ্য বয়স সে তুলনায় বেশী নয়, তবু চিনুকে একবার—।

চাপা গলায় ধমক দিলেন নিভাদেবী, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না। মেয়ের আবার মত কি? একি সাহেব-সুবোর বিয়ে হচ্ছে? তা ছোট ভাইয়ের মেয়ের জন্য অতই যদি দরদ, তবে দেওয়ালে পোষ্টার মেরে স্বয়ংবর সভা ডাক না। কোন রাজপুত্তুর এসে বরণ করে নিয়ে যাক

বিজয়বাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নাকি বলবার মত কিছু নেই বলে আমতা আমতা করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন বাইরে থেকে ডাক শুনে।

—বিজয়বাবু আছেন নাকি?

বিজয়বাবু সামান্য চমকালেন। মুখটা শুকিয়ে গেল। অসহায়ের মত একবার স্ত্রীর দিকে, আর একবার প্লেটের ওপর ঝুঁকে থাকা কানুর দিকে তাকালেন। তারপর ইশারায় স্ত্রীকে বললেন, যাওনা একটু, কিছু একটা বলে এস না। ভাড়াটা যোগাড় না করে দেখা করতে ভাল লাগছে না।

দাঁতে চেপে বললেন নিভাদেবী, কেন, আজীবনতো কচি কচি বোকা ছাত্রগুলোকে দৃঢ়চিত্ত হেন তেন কত কি হবার উপদেশামৃত বিতরণ করে এলে, এবার যাওনা নিজে।

আর একবার হলধরবাবুর ডাক শোনা গেল। চিনু পাশের ঘর থেকে সবই শুনছিল। নিজেই এবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিজয়বাবু শুনতে পেলেন চিনু যেন কি বলছে হলধব বাবুকে। সবটা বোধগম্য হল না। কিন্তু হলধব বাবুব কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল, উনি এলে বলে দিও যে প্রত্যেক মাসে এভাবে টেনে-হিঁচড়ে ভাড়া আদায় কবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নেহাৎ তোমরা অনেকদিন থেকে আছ, তাছাড়া বিজয় বাবু আমার ছেলের স্কুলের মাষ্টার মশায়, নাহলে অন্য কেউ হলে এতদিনে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের কবে দিতাম।

ঘরের ভেতর কাঠ হয়ে বসে শুনলেন বিজয়বাবু।

ছুটি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত কানু তাগাদা দিল, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে, তারপর ?

বিজয়বাবু সামান্য চমকালেন যেন। গভীব দৃষ্টিতে কানুর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ম্লান হেসে নিজেকেই যেন বললেন, এটা আগের টুকু, পরের টুকু এখনও জানি না। যা, আর লিখতে হবে না।

কানু হল্লা টের-পাওয়া হকাবেব ত্রস্ততায় শ্লেট বই গুটিয়ে ফেলে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। চিনু ঘবে এসে জ্যাঠামশায়কে দেখে যেন অবাক হল, আরে, তুমি কখন এলে ? আমি এইমাত্র হলধর বাবুকে বলে দিলাম তুমি বাড়ী ফের নি।

বিজয়বাবু দুঃখিত হয়ে বললেন, এই দেখ, খোঁজ না করেই বলে দিলি, আজ ছাত্ররা পড়বে না বলে অনেকক্ষণ হয় ফিরেছি। যাকগে পরে দেখা করা যাবেখন।

নিভাদেবী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেশ জানেন -দুজনেই দুজনের সঙ্গে অভিনয় করে গেল, কিন্তু কি সূক্ষ্ম অভিনয়, সকলেরই মান বেঁচে গেল। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারস্যাপার আসে না

নিভাদেবীর। সামনে থাকলেই বেফাঁস কি বলে ফেলবেন, তার চেয়ে সরে আসাই ভাল।

বাইরে আসতেই দেখেন কানু তপনকে নিয়ে সগর্বে বাড়ীতে ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতেই ঘোষণা করল কানু, জান মা, তপনদা না, লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি জোর করে টেনে আনলাম।

তপন প্রতিবাদ জানাল, না কাকীমা, একটু কাজে যাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম কাজটা সেরে তারপর আপনাদের এখানে আসব। কিন্তু তাহলে কানুবাবুর বাহাদুরীটা মাঠে মারা যায় বলে নিজেই এলাম।

নিভাদেবী একটু হেসে বললেন, ভালই করেছ। অনেকদিন তো আসনা এদিকে।

বিনয়ের সঙ্গে বলল তপন, একেবারে সময় পাই না। নানান কাজে এমন জড়িয়ে পড়েছি। তা কাকাবাবু কোথায়?

কাকীমা সামনের দিকে চোখ ইশারা করে বললেন, ভেতরেই আছেন। আলো জ্বালানোর কাজটা আজ নেই কিনা।

তপন একটু অবাক হল। কর্পোরেশনের গ্যাস বাতী জ্বালানোর কাজ নিশ্চয়ই নয়, তাহলে আবার জ্বালানোর কাজ কি? শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে বসল, আলো জ্বালানোর কাজ মানে?

নিভাদেবী গম্ভীর স্বরেই জবাব দিলেন, জ্ঞানের প্রদীপ না কি যেন জ্বালিয়ে যাওয়া মাষ্টারদের পবিত্র কর্তব্য, সেই।

হো হো করে হেসে উঠল তপন।—তাই বলুন। অলঙ্কার দিয়ে বলছিলেন।

এতক্ষণে একটু ম্লান হাসলেন নিভাদেবী, আর কোন অঙ্গে নেই বলে জিভটাকেই আপাতত অলঙ্কারে ভূষিত করেছি।

চিনু ওদের কথাবার্তা শুনে বাইরে এসেছিল।' এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে বলল, জান জেঠিমা, মিষ্টি খাওয়াবার ভয়ে একটা সুখবর চেপে যাচ্ছে তপুদা।

নিভাদেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

—একটা ভাল চাকরি পেয়েছে তপুদা।

নিভাদেবীর নির্বিকার মুখে সাধারণত কোন সুখদুঃখের অনুভূতি রেখায়িত হয় না। স্পষ্ট দ্রষ্টারা ওঁর ভুরুর ঈষৎ কুঞ্চন বা ঠোঁটের উদ্ভাসাভাস থেকে ফলাফলটা বুঝে নেয়। চিনুও লক্ষ্য করে বুঝল জেঠিমা খুসী হয়েছেন। স্বভাবতই এটা খুসীর কারণ হল চিনুর।

ইতিমধ্যে কানুর অন্য ভাই-বোনেরা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তপনকে। ওরা খবরটা পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। একটা ভদ্রস্থ উপলক্ষ পেয়ে চেপে ধরল তপুদাকে মিষ্টি খাওয়াবার জন্য।

অনেক টেনে টুনে একটা গেঞ্জি কেনার জন্য দুটো টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল তপন। কিছুটা কাষ্ঠ হাসি ও টাকা দুটো অগত্যা বের করে দিতে হল তপনের। হৈ হৈ করে মিষ্টি আনতে চলে গেল ওরা। তপন বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরে এসে ঢুকল।

বিজয়বাবু খুসী হলেন, এস, অনেকদিন পরে এলে বোধহয়।

তপন বসতে বসতে বলল, ভীষণ কাজের চাপ পড়ে গিয়েছে, সময় পাই না।

বিজয়বাবু উৎসাহ দিলেন, ঘোর, ঘোর; ব্যবসাতে যত খাটবে তত উন্নতি।

চিনু ভ্রমসংশোধন করে দিল, জ্যাঠামণি, তপুদা ভাল চাকরি পেয়েছে একটা।

প্রতিবারই চাকরির উল্লেখে মনে মনে কুণ্ঠিত হচ্ছিল তপন। অস্বস্তি অনুভব করছিল। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে টেনে নেবার জন্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল তপন, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন বিজয়বাবু, তাই নাকি, ভীষণ খুশি হলাম। তা কোথায় হল?

দি ইণ্ডিয়ান পর্যন্ত বলেই সামলে নিল তপন। ঢোক গিলে বলল, একটা পাবলিশিং কনসার্ণে।

বিজয়বাবু স্তিমিত হলেন, ও, আমি ভেবেছিলাম কোন অফিসে।

এ চাকরিও ভালই, বেশ পরিচ্ছন্ন। মানে, শুধু বই-টই আর গুণীজন নিয়ে কারবার।

অফিসে নয় শুনে বিজয়বাবুর কিছুটা উৎসাহের অভাবে উৎসাহিত হল তপন। জ্যোতিটার বুদ্ধি আছে!

বিজয়বাবু ওকে বসতে বলে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে থাকল শুধু চিনু আর তপন। চিনুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে একটু হেসে বলল তপন, ছোটদের তো মিষ্টি কিনে দিলাম, তোমার জিনিসটা কাল পাবে।

একটু অবাক হয় চিনু।—আমার জিনিস? কি?

—একটা ঢোল।

—ঢোল!

—হ্যাঁ। অবশ্য আমারই স্বার্থে। ওটা নাহলে পাড়ায় পাড়ায় আমার চাকরির বার্তাটা ঠিকমত ঘোষিত হচ্ছে না। ভারটা এখন নির্ভয়ে তোমার ওপর দেওয়া যায়।

একটু হাসল চিনু, কেন, চাকরির খবরটা গোপন রাখার ইচ্ছে ছিল নাকি?

—তা একটু ইচ্ছে ছিল বই কি। কাল থেকেই তো মেয়ের বাবার কিউ শুরু হবে বাড়ীর সামনে।

চিনু একটু গম্ভীর হল। লক্ষ্য করল তপন। এবং কেন যেন ভাল লাগল। ছোট্ট একটা নাম-না-জানা মিষ্টি অনুভূতির স্বাদ পেল।

চিনু বার দুয়েক তপনের চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, বস, কানু মিষ্টি এনেছে বোধহয়। চা করে আনি।

তপন বলল, দাঁড়াও। ও তো সর্বজনীন মিষ্টি। ঘোষকের ভূমিকার জন্য আরো কিছু উপরি পাওনা তুমি পেতে পার। কি দেওয়া যায় বল তো।

ম্লান হাসল চিনু, কিউ থেকে যে ভাগ্যবান বাবাটি নির্বাচিত হবেন, তাঁর মেয়ের শুভ কাজের দিন আর একবার মিষ্টি খাইয়ে দিও। আমরা ইতর ব্যক্তি, ওতেই খুশি।

হাসল তপন, মনে থাকল। তবে তার আগে তো ইতর ব্যক্তিটিও গোত্রান্তরিত হয়ে নাগালের বাহিরে চলে যেতে পারে। অতএব তার আগে সেই ব্যক্তিটিকে একদিন একটা সিনেমা দেখান যেতে পারে বোধহয়।

চিনু কোন উত্তর দেবার আগেই বিজয়বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। চিনু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পথে আসতে আসতে চিনুর কথাই ভাবছিল তপন। ওদের আলো-আঁধারী সম্পর্কের কথা। ছেলেবেলা থেকে পাশাপাশি বাড়ীতে ছিল। যোগ-বিয়োগে সম্পর্কের যে ফলাফল বেরিয়েছিল সেটাও মধুর, বৈবাহিক সম্পর্ক। সহজ মেলামেশা আর সরস হাসিঠাট্টার পথে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না তাই কোনদিনই। কিন্তু বেশ কিছুদিন হয় সেই সহজ সাদা সম্পর্কের ভেতর নতুন একটা আলোর আভাস টের পাচ্ছে যেন দুজনেই। এতে মাঝে মাঝে খুশি হয় তপন। মাঝে মাঝে ভীত। বিশেষ করে নিজের বর্তমান অবস্থা ভেবে। এবং ভবিষ্যৎ অনুমান করে। কিন্তু সার্টের বুক পকেটে টাকা না থাকলেও বুক পকেটের ঠিক নিচেই মন বলে একটা পদার্থ থাকে মানুষের। পেটের মতই যেটা সবসময় নিজের সামর্থ্যের কথা মানতে চায় না। সেরকম দু-একটা মোলায়েম মুহূর্তে নিজের অজান্তেই কেমন যেন কিছুটা বেহিসেবী হয়ে পড়ে তপনও। দ্ব্যর্থবোধক রসিকতা করে বসে। অথবা আজকের মত সিনেমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে। যেজন্য পরে নিজের ওপরই রাগ হয়। চিনুর জন্য সহানুভূতি অনুভব করে, মিথ্যেই মেয়েটার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিচ্ছি। অথচ সম্ভব নয়, ওসব সম্ভব নয়। এবং আদৌ সে রকম কোন সম্পর্ক নয় ওদের। জোর দিয়ে মনে মনে সম্পর্কটাই অস্বীকার করার চেষ্টা করে তপন। নিজেকে ভয় পায় বুঝি।

ছয়

দিন কয়েকের ভেতরই, সবার সঙ্গে না হলেও, সাহেবের সঙ্গে খাতির হয়ে গেল তপনের। অবশ্য কৃতিত্বটা সাহেবেরই। পুরানো সাহেবদের কাছ থেকে যে কটা গুণ মিঃ রাহা আহরণ করে রেখেছেন, গুণীর আদর তার ভেতর একটা। তপনের গুণ ব্যবহারের অভাবে মরচে পড়ুক এটা চাইতেন না বলেই বোধহয় সময়ে অসময়ে যখন-তখন তপনকে ডেকে পাঠান মিঃ রাহা। তারপর অফিসের কাজ, স্বাধীন হবার এতদিন পরেও, ছকবাঁধা থেকে যাওয়াতেই, ছকের বাইরে কাজ করার সুযোগ দেন তপনকে। মাঝে মাঝে দুচারটা বাংলা কাগজে গল্প প্রবন্ধ অনুবাদ করে থাকেন মিঃ রাহা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে সম্বন্ধে আলোচনা বা সাহায্য করতে হয় তপনের এবং মিঃ রাহার হাবভাব দেখে বেশ বোঝা যায়, তপন নেহাত গুণী বলেই এ-অনুগ্রহটুকু ওকে করেন তিনি। না হলে পুরো সৃষ্টির আনন্দটা নিজেই একা ভোগ করতেন, তপনকে ভাগ দিতেন না।

বোঝে তপন, অফিসের সবাই আড়ালে হাসে। অবশ্য জানে তপন, সকলে না হলেও অন্তত কয়েকজন এ সুযোগ পেলে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও খুশিতে হাসত। তবে ওসব সেরকম গায়ে মাখেনা ও। ভাল করে যাদের সঙ্গে আলাপই হয় নি তাদের ভাবা না ভাবা নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামালেও চলে।

অবশ্য সাহেবের সঙ্গে তপনের ঘনিষ্ঠতায় একজন খুব খুশি। শ্রীকৃষ্ণ হালদার। কোনদিন ওর পক্ষ হয়ে সাহেবকে কিছু বলবার প্রয়োজন হলে এখন আর লোকাভাব হবেনা ভেবেই বোধহয়।

ইতিমধ্যে মন্দিরার সঙ্গেও কাজের সূত্রে সম্পর্কটা কিছু সহজ হয়েছে তপনের। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মন্দিরার মনোভাবটা এখনও আলোছায়ার পর্যায়ে আছে। খাতিরের অংশীদার ভেবে ঈর্ষা বোধ

করছে, না, বেগারখাটা দেখে সহানুভূতি অনুভব করছে ঠিক বুঝতে পারে না তপন। তবে বোঝে, এ প্রসঙ্গে তপনের মনোভাবটা সঠিক টের না পাওয়ায় অস্বস্তিতে আছে মন্দিরা। মাঝে মাঝে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তাই সতর্ক ভাবে টোকা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে বোধহয় তপনকে।

নিকাজ অবসরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এসব কথাই ভাবছিল তপন। কাজ যে একা ওরই নেই তা নয়, অনেকেরই অনেক সময় থাকে না। তখন কেউ চা খেতে যায়, কেউ গল্প করে, কেউ বা ঘুমায়। ঘুমানোর মত পুরানো হয়নি এখনও তপন, তাই ও এসব সময় বসে বসে ভাবে অথবা পুরানো চিঠিপত্রের ফাইল ঘাটে। পুরানো চিঠিপত্র ঘাটার ভেতর একটা মাদকতা আছে। বেশ লাগে তপনের। সেদিন হঠাৎ ফাইল ঘাটতে ঘাটতে একটা মজার চিঠি পেয়েছিল। এই ঘুম প্রসঙ্গেই কয়েক বছর আগের প্রাক্তন এক কেরাণী ভদ্রলোকের কাছে ঘুমের অভিযোগে এক্সপ্ল্যানেসন চাওয়া হয়েছিল। অভিযোগটি সুন্দর ভাবে অস্বীকার করেছেন ভদ্রলোক। লিখেছেন, আই ওয়াজ নট্ স্লিপিং, বাট্ টেকিং রেস্ট উইথ ক্লোজড্ আইজ।

কি শাস্তি হয়েছিল ভদ্রলোকের সেটার হদিস পায়নি ফাইল হাতড়ে। তবে এটা অনুমান করেছে যে, কঠিন কোন শাস্তি পেতে হয়নি। কারণ কর্মক্লান্ত করণিকদের চেয়ারে বসে ক্ষণ-বিশ্রাম গ্রহণ অফিসকোডে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য নয়। এবং সে-বিশ্রাম গ্রহণ মুদ্রিত নেত্রে বাঞ্ছনীয় কিনা তা নিশ্চয়ই নিয়মাবলীতে মুদ্রিত নেই। এবং কে না জানে অফিস মাত্রই মুদ্রিত নিয়মাবলীর অক্ষর মেপে চালিত হয়। অফিস মাত্রেরই এটা মুদ্রাদোষ।

—সাহাব আপকো সালাম দিয়া।

পিয়ন সংবাদ বহন করে আনল। চিন্তায় ছেদ পড়ল তপনের। সোজা হয়ে বসল। বলল, যাচ্ছি।

প্রথম প্রথম এরকম ডাক পড়লে ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠত তপন। কোথায় কোন্ ভুল হয়ে গেছে কিনা কে জানে। কিন্তু আজকাল আর

ভয় হয় না। মোটামুটি অনুমান করতে পারে কেন ডাক পড়েছে। তবু জরুরী একটা ফাইল হাতে নিয়েই সাহেবের ঘরে গেল তপন। ঘরে ঢুকেই ফাইলটা এগিয়ে দিল সামনে।

মিঃ রাহা সঙ্কুচিত হলেন, আরে না না ফাইলের জন্য ডাকিনি। এমনি একটু খোঁজ খবর নিতে ডেকেছিলাম। এখনতো আর সেই সাহেবআমল নেই, অফিসারদের এখন সাবডিনেটদের সঙ্গে বন্ধুর মতই মেশা উচিত। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

তপন বসল। এবং মনে মনে আঁচ করল, আজকের সম্ভাব্য দায়িত্বটা সামান্য গুরু। খাতিরেই সেটা অনুমানেয়।

পেপার ওয়েটটা নাড়তে নাড়তে মিঃ রাহা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, কাজ টাজ কেমন চলছে? কোন অসুবিধে বোধ করছেন না তো?

বিনয়ের সঙ্গে বলল তপন, একটু ঘুরিয়ে তো সেটা আমারই জানতে চাওয়া উচিত স্যার, কেমন লাগছে আমার কাজ। কোন অসুবিধে বোধ করছেন না তো?

মিঃ রাহা প্রশংসা করলেন ওর কাজের। বললেন, আপনার কাজে সকলেই খুব খুসী। একেবারে নতুন ঢুকেছেন তা নাহলে অশোক-বাবুর রিটেয়ার করা পোষ্টটা আপনাকেই দেওয়া যেত।

তপন চুপ করে থাকল। পেপার ওয়েটটা তখনও মিঃ রাহার হাতে ঘুরছে। বুঝল তপন আসল প্রসঙ্গটায় আসার ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। ভূমিকা-পর্ব শেষ করে আসল পাঠের শুরুটা হাতড়াচ্ছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তপনই তাই সহায়তা:করল।—এ সংখ্যা 'সাহিত্যাঙ্গনে' আপনার লেখাটা পড়লাম স্যার। বেশ লাগল।

মিঃ রাহা উৎসাহিত হলেন। তবু কপট বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আরে দূর, ও আবার লেখা নাকি? এত তাড়াহুড়ায় কি লেখা হয়? এইতো আর একটা বিপদ সামনে হাজির। পাড়ার একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধরেছে এই রোববার ওদের ওখানে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে বা পড়তে হবে। কি করি বলুনতো?

তপন উৎসাহ দিল, ওরা যখন আপনার কাছ থেকে সত্যই কিছু শুনতে উৎসাহী তখন আপনার না করা উচিত নয় স্যার।

সাহেব বিরক্ত প্রকাশ করে বললেন, আপনি তো বলেই খালাস, কিন্তু এই কাজের চাপের ভেতর কখন কি তৈরী করি বলুন তো। তারপর একটু হেসে বললেন, অবশ্য আপনি কষ্ট করে একটু সাহায্য করলে হয়তো—

সোৎসাহে রাজী হয়ে যায় তপন, না না এতে কষ্টের কি আছে। আমি দু'তিন দিনের ভেতরই আপনাকে কিছু পয়েন্টস দিয়ে যাব না হয়।

সাহেব খুসীতে বিগলিত হলেন, তাহলে তো খুবই ভাল হয়। পয়েন্টগুলো তাহলে একটু বাড়িয়ে টাড়িয়েই লিখে আনবেন। আর হাল আমলের লেখকদের কিছু রেফারেন্স টেন্স, মানে— ।

তপন অভয় দিল, সেসব আমি ঠিক করে দেব স্যার।—বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, আমার দু-চার জন ফ্রেঞ্চ বন্ধু আছে কলকাতায়, ওদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতে পারলে ভাল হয়। দুচারটা রেফারেন্স বই-টইও দেখে নেবার প্রয়োজন হতে পারে। দরকার হলে কাল স্যার আমি—।

শেষ করার আগেই সাহেব বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, ঠিক আছে, না হয় অফিসে নাই আসবেন। ওতে আর কি আছে।

খুসি হয়ে বেরিয়ে এল তপন। পারিশ্রমিক হিসেবে একদিনের ছুটি, এইবা মন্দ কি? রেহাই পাবার যখন পথ নেই তখন একেবারে মুফত্ আর ছাড়ে কেন! অবশ্য স্বপনের একটু খাটনি হবে। তা হোক।

ফিরে নিজেদের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে টের পেল তপন আজকের দৈনিক পত্রিকার কি একটা সংবাদকে কেন্দ্র করে যেন জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে ঘরে। চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে আলোচ্য সংবাদটির সারমর্ম টের পেল তপন। বর্দ্ধমানের একটি গ্রামে ম্যাট্রিকুলেট এক ভদ্রলোক নিজেকে এম.এ পাশ বলে পরিচয় দিয়ে

দীর্ঘ দশবছর প্রধান শিক্ষকের কাজ চালিয়ে এতদিনে ধরা পড়েছেন। পুলিশ জানতে পারায় গা ঢাকা দিয়েছেন নাকি।

শিক্ষা লাইনেও এরকম বাটপাড়িতে মর্মে মর্মে চটে গিয়েছে সবাই। আলোচনায় তাই তীব্র উত্তাপ। কিন্তু অনুপস্থিত সেই ভদ্রলোক প্রসঙ্গে যে সমস্ত উক্তি ও বিশেষণ বর্ষিত হচ্ছিল তাতে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করল তপন। সহানুভূতি অনুভব করল সেই ভদ্রলোকের জন্য। কেমন যেন একটা একাত্মতা অনুভব করল। এবং শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, এই প্রথম সহকর্মীদের আলোচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দিল তপন।

শান্ত কিন্তু ধীর স্বরে বলল, কিন্তু আমার মনে হয় ভদ্রলোককে পুরস্কৃত করা উচিত।

অবাক হয়ে একসঙ্গে সবাই ফিরে তাকাল তপনের দিকে। বেশ কিছুটা সময় নিল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে। তারপর একজন চটুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেন ?

—কারণ ভদ্রলোক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটাই জীবনের একমাত্র ছাড়পত্র নয়।

সর্বজ্যেষ্ঠ কানাইদা নির্লিপ্তভাবে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচতে খুঁচতে বললেন, তাহলে অত টাকা দিয়ে বি-এ, এম-এ হেড্‌মাষ্টার না রেখে নন্‌ম্যাট্রিক হেডমাষ্টার রাখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

তপন সোজা কানাইদার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, আমি সেকথা বলিনি। সব নন্‌ম্যাট্রিকই হেড্‌মাষ্টার হবার যোগ্য, সেকথা বলছিনা আমি। কিন্তু কোন নন্‌ম্যাট্রিক যদি যোগ্য হন-তাহলে কেন তার নামের পিছনে একটা সিলমোহর নেই বলে বঞ্চিত করব তাকে ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনি বলতে চান সার্টিফিকেটের কোন দামই নেই ?

তপন একটু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল, হঠাৎ ভুলে-কারো বার্থ

রেজিষ্ট্রেশন না করা থাকলে তার জন্মটাই নাকচ করে দিতে চান আপনি ?

সেদিনের শান্তিবাবু এবার ফোড়ন কাটলেন, নিজে তাহলে এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে ইউনিভার্সিটির সবকটি সার্টিফিকেট যোগাড় করলেন কেন ?

তপনের স্বর তীক্ষ্ণ হল। দেশের চাল যাদের হাতে তারা বিনা কার্ডে চাল দেবে না বললে রেশন কার্ড না করে উপায় থাকে না। আমার তো মনে হয় আমারা দু'তিনটে পাশ করে এখানে বসে যা করি, যে কোন নন্‌ম্যাট্রিককে দিয়েও সে কাজ হয়।

সদ্য পাশ করে এসে ঢোকা একটি ছেলে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাল এবার, পাগলের মত কথা বলছেন আপনি।

তপন তৈরী হয়েই নেমেছিল। না চটে একটু হেসে বলল, অনেক সত্য বক্তাই সমসাময়িক যুগে পাগল বলে নিন্দিত হয়।

কানাইবাবু এবার চটে উঠলেন, ওঃ, আর আমরা সবাই মিথ্যে বক্তা হলাম, না ? নিজের কথাটাই বা এমন বেদবাক্য ভাবছেন কেন ?

তপন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, এটা আমার স্থির বিশ্বাস বলে।

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, বাজে বকবেন না মশায়।

এতক্ষণে এই প্রথম মেজাজ হারাল তপন। সোজা বক্তার দিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে বলল, কার কথা বাজে সেটা প্রমাণ করার শক্তি থাকলেও ঠিক সুযোগ নেই এখন। নাহলে এর উত্তর দিতে পারতাম আমি।

শান্তিবাবু আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন পরিচিত জুতোর মসমসানিতে। সকলেই মুহূর্তে যার যার কাজে ডুবে গেল। মিঃ রাহা ওদের সামনে দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়েছিল তপনের একবার তুরুপের তাসটা ফেলে দিয়ে নিজের জয়কে সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে। কিন্তু সামলে নিতে হল সে ইচ্ছে। তর্কটা অগ্নিমুখ হয়ে ওঠার আগেই যে থেমে গেল তাতে মনে মনে খুসিই হল তপন।

কিন্তু সাময়িকভাবে থমকে থাকা আলোচনাটাকে আবার চাঙ্গা করে তুলতেই যেন এবার এগিয়ে এল মিস্ মিত্র। কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

কাঠের ছোট্ট পার্টিশানটার ওপার থেকে বেরিয়ে এসে একটু হেসে বলল, দেখুন, এখানে বোধহয় আমি আনকলড্ ফর্, কিন্তু পাশের ঘর থেকে সব শুনছিলাম আমি। আমি কিন্তু মিঃ গুপ্তকেই সাপোর্ট করি।

শ্রীকৃষ্ণবাবু এতক্ষণ এসবের কিছুই শোনেন নি। শুক্রবারের সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা থেকে দেশবিদেশের সিনেমা-কুঞ্জের শ্রীরাধিকাদের সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন। বামা কণ্ঠে হঠাৎ সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ইয়েস, আমিও সাপোর্ট করি।

এক ভদ্রলোক ধমক দিলেন, আপনি আবার এখানে নাক গলাতে এলেন কেন ? কিছু জানেন না শোনেন না, হুট করে একটা মত দিয়ে বসলেন।

রীতিমত চটে গেলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, জানিনা মানে, আপনারাই সবজান্তা নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে, বলুন আপনি কি সাপোর্ট করেন।

এবার একটু ঘাবড়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। কাতর দৃষ্টিতে একবার তপন ও একবার মিস্ মিত্রের দিকে তাকালেন। বোধহয় সাহায্যের আশায়। তারপর আমতা আমতা করে বলে ফেললেন, মিস্ মিত্রকে।

সমবেত অট্টহাসিতে প্রথমে সামান্য হকচকিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, তারপর নিজেও প্রাণ খুলে যোগ দিলেন সে হাসিতে।

আর সে হাসিই হল এ আলোচনা-উৎসবের সমাপ্তি সঙ্গীত।

এ আলোচনার এখানেই শেষ, কিন্তু সুদূরপ্রসারী আর এক অধ্যায়ের এখানেই শুরু।

সেদিন অফিস থেকে বেরুচ্ছে তপন, বাস স্টপেজের কাছে পাশে এসে দাঁড়াল মিস্ মিত্র। বিনা ভূমিকাতেই বলল, আলোচনাটা তখন বন্ধ হয়ে গেল, তাই বলবার সুযোগ পেলাম না, নাহলে আমারও কিছু বলবার ছিল। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

এমনিতেই তর্ক করে মনটা খারাপ ছিল তপনের। একজন সমব্যথী পেয়ে আজ আর আগের মত খারাপ লাগলনা মন্দিরার এ গায়ে-পড়া আলাপ। বলল, দেখুন, এটা ঠিক তর্কের বিষয় নয়, উপলব্ধি করার মত সমস্যা। এগুলো যে সমাজের কত বড় এক একটা গ্লানির দিক সেটা বোধহয় এরা ভেবেও দেখে না।

সুগোল রিস্টটা তুলে সময় দেখল মন্দিরা। তারপর বলল, আপনার খুব তাড়া আছে? নাহলে চলুন না, একটু চা খাওয়া যাক।

তপন কিছু বলবার আগেই পাশ থেকে বিজয়বাবু হঠাৎ ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একগাল হেসে বললেন, কিহে তপন, তোমার বইয়ের দোকানের কাজ—।

ভদ্রলোককে দেখেই একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল তপন। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। সামলে নিয়ে সোৎসাহে তাঁর কথার মাঝখানেই বলে উঠল, ও, আরে আপনি? আসুন, একটু এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে ও বিষয়ে একটু কথাও আছে।

বিজয়বাবুকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল তপন। যাবার সময় অবশ্য বলে গেল মন্দিরাকে, একটু ওয়েট্ করুন, আসছি।

বিজয়বাবুকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল তপন। হেসে বলল, এই চলছে একরকম। স্কুল-কলেজের সিজন্ পড়ল কিনা।

বিজয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, ভাল চললেই ভাল, যা দিনকাল। তা কি কাজের কথা আছে বলছিলে?

মুহূর্তে ভেবে নিতে হল তপনের কাজের কথাটা। তারপর বলল, হ্যাঁ, মানে, কথাটা আর কি ঐ ব্যবসা সম্বন্ধেই। ওরা ক্লাশ ফাইভ্-সিক্সের একটা জ্যামিতি বইয়ের জন্য একজন লেখক খুঁজছিল। অবশ্য

বইয়ে লেখকের নাম হিসেবে একজন এম-এস্ সি, এম-কম, বি-টি বিলাত ফেরত ডক্টরেটের নাম থাকবে। সেজন্য তাকে কিছু টাকাও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তা আপনার কি সময় হবে ?

একটু লাজুক লাজুক হাসলেন বিজয়বাবু, সেই বলেনা, পাগলা খাবি ? না হাত ধোব কোথায় ?

হো হো করে হেসে উঠল তপন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব তাহলে। তা এদিকে কোথায় ?

বিজয়বাবু বললেন, একটু কাজে এসেছিলাম। তা তুমি এ সময়ে এখানে ?

ফাঁড়াটা কেটে যাওয়ার স্বস্তিতে বলে বসল তপন, একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল কিনা। বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।

বিজয়বাবু সামান্য চিন্তিত হলেন, ছুটি ! মানে তোমার দোকান কি—

ততক্ষণে খেয়াল হয়েছে তপনের কুস্তির ময়দানে নেমেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তবু কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, না না, আমার অফিস না। আমাদের কিছু বই এখানে এক অফিস-লাইব্রেরিতে দেওয়া হয়েছিল। তারই টাকার জন্য এসোছলাম। তা ছুটি হয়ে গেল কিনা। একটু আগেই ছুটি হয়ে গেল।

বিজয়বাবু তৃপ্ত হলেন, ওঃ, তাই বল, আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তা—সঙ্গের মেয়েটি কে ?

বেমালুম বলে দিল তপন, বৌদির বোন। অফিস থেকে ফিরছিল, হঠাৎ দেখা।

খুশিতে গদগদ হয়ে উঠলেন বিজয়বাবু, আরে, গৌরীর বোন সেই টেঁপি ? সেই এতটুকু দেখেছিলাম ওকে—এত বড়টি হয়েছে। ডাকি ত হে টেঁপিকে, দেখি চিনতে পারে কিনা।

মাথায় আকাশ-ভেঙ্গে পড়ল তপনের। বিলকুল ভুলে গিয়েছিল তপন, বৌদির মামাবাড়ি আর চিনুর এই জ্যাঠা বিজয়বাবুর এক-সময়ে কর্মস্থল একই জায়গায় ছিল। তপনের ভরসা ছেড়ে বিজয়বাবু

নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন টেঁপিকে ডাকতে, হাত টেনে ধরল তপন, কি করছেন কাকাবাবু? বড়বৌদির বোন নয়, আমার মামাত বৌদির বোন।

বিজয়বাবু লজ্জা পেলেন, ওঃ, তাই বল, আমি ভাবলাম টেঁপি। আচ্ছা চলি ভাই। তুমি ঐ ব্যাপারে তাহলে একটু চেষ্টা কর।

বিজয়বাবুকে বিদায় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এল তপন। মন্দিরাকে কেমন যেন একটু গম্ভীর মনে হল। তপন ফিরতেই জিজ্ঞেস করল মন্দিরা, আচ্ছা, ভদ্রলোক আপনাকে তপন বলে ডাকলেন না?

গলা শুকিয়ে গেল তপনের। ঢোক গিলে বলল, কেন, তপনই তো বলবে। আত্মীয়-স্বজনরা কি অফিসের পোষাকী নামে ডাকবে।

মন্দিরা লজ্জা পেল। বলল, ওঃ, ওটা আপনার বাড়ির নাম বুঝি? সাধারণত বাড়ির নাম খেঁদী, বুচি, পটলা, মদনাই থাকে কিনা। ভদ্রলোক আপনার আত্মীয়?

এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে তপন, লড়াইয়ের মাঠে নেমেছে যখন তখন হয় মারতে হবে, নয় মরতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম নাস্তি। মন্দিরার সম্ভাব্য সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটানর জন্য তাই বলল, আত্মীয় ঠিক নয়, তবে পারিবারিক ভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঐ যে বইয়ের দোকানের কথা বলছিলেন, আমাদের একটা পাবলিশিং কর্নসার্নও আছে, তারই কর্মচারী উনি। একটু অনুযোগ করে বলছিলেন যে, কি হে, তোমার বইয়ের দোকানে একবার ঢুঁ মারবারও সময় হয়না আজকাল। আচ্ছা আপনিই বলুন, এই অফিসের খাটাখাটুনির পর কারো ভাল লাগে বইয়ের দোকানের খবরদারি করতে।

বইয়ের দোকানের সূত্রটাও ঠিক ধরতে পারছিল না মন্দিরা কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই সন্দেহ মিটে গেল এবার। খুশি হল তপন এত সহজে ওকে স্বীকার করে নেওয়াতে। প্রথম দিকের গাম্ভীর্য দেখে ভয় ছিল ওর, হয়তো পাত্তা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। খুশি

হয়ে আত্মীয়তার সুরে বলল মন্দিরা, সে তো ঠিকই। তাছাড়া শরীরের দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। আচ্ছা, চলুন তা হলে চা খেয়ে আসা যাক।

তপন আপত্তি করল না, বলল, চলুন।

সাত

আজ অফিস নেই। রেফারেন্স বই আর তুচার জন ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফরাসী সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লেখার জন্য আজ ছুটি তপনের। লেখার ব্যবস্থাটা অবশ্য জ্যোতিই করে দিয়েছে। কোন্ একটা কাগজে ও লিখবে বলে স্বপনকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে। নির্লিপ্ত দাদাকে দেখে অনুমান পর্যন্ত করতে পারলনা স্বপন যে এর সঙ্গে দাদার ন্যূনতম কোন যোগাযোগ আছে।

তপন দৈনিক পত্রিকাটার দ্বিতীয় পাতাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। তপন পত্রিকার দ্বিতীয় পাতার পাঠক। ওর মতে দেশের সত্যি চেহারা পাওয়া যায় ঐ পাতাতেই। কর্মখালী, কর্মপ্রার্থী, জমি-বাড়ী, পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকেই। যেখানে, টাকার বিনিময়ে হলেও, দেশবাসীর নিছক নিজের কথাগুলো ছাপা হয়। ভাড়াকরা কাগজে লোকদের আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সেগুলো শুধু হর্ষক বা লোমহর্ষক সংবাদে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায় না। আর পড়ে বিচিত্র রসের আইন ও আদালত। আধুনিক গল্প-উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব ও আধুনিক যে বিভাগটি।

—কি দাদা বাজারে যাবে না?

তপন চোখ তুলে হেসে বলল, বাজারেই ছিলাম।

ইতু অবাক হল, বাজারে?

কাগজ বন্ধ করতে করতে বললে তপন, হাপুর বাজারে। আমাদের হাপুস-বাজারের চেয়ে অনেক অভিজাত বাজার সেটা, বুঝলি? ও তুই বুঝবি না, আর এককাপ চা নিয়ে আয় বরং।

—উনুন আটকা আছে, একটু দেরী হবে কিন্তু। তোমার অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

হাসল তপন, জানিস, সাহেবরা চলে গেলেও জোরজার করে ওদের কয়েকটা গুণ আমরা কেড়ে রেখেছি। আজকাল সব অফিসই একটা নীতি মেনে চলে, বেটার লেট্ দ্যান নেভার।

ইতু স্বপনের দুধের বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল। আর, একটা বিড়ি ধরিয়ে টান টান হয় শুয়ে পড়ল তপন। ছুটির আমেজটা বেশ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। কাজে ঢোকার পর এই প্রথম স্বনির্বাচিত ছুটি।

মন্দিরা কাল একদিন ওদের বাড়ী যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। আজ মন্দিরাও ছুটি নিলে একবার যাওয়া যেত। মনে মনে হাসল তপন, অবশ্য ওর ছুটি নেই বলেই ভাবছি, থাকলে নিশ্চয় যেতাম না। মাত্র এই ক'দিনের আলাপে কোন সহকর্মিণীর বাড়ী যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে বৈকি। তাছাড়া বাড়ীর বাবা দাদার কথা ছেড়ে দিলেও পাড়ার দাদাদের ব্যায়াম-ট্যায়ামের অভ্যেস আছে কিনা সঠিক না জেনে আজকাল কোনখানে হুট্ করে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দিনকাল বড় খারাপ। মন্দিরাও নিশ্চয়ই ভদ্রতা করেই যেতে বলেছিল। যাবেনা জানতো বলেই অমন জোর দিয়ে বলেছিল। মেয়েটা শুধু ভদ্রই নয়, বেশ আলাপী ও চালাকচতুর। ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সূক্ষ্ম রস বোধটা একটা আলাদা গুণ। আর কিছু না হলেও ওর সঙ্গে আলাপ করে অন্তত আরাম পাওয়া যায়। বন্ধু হিসেবে বোধহয় মেয়েটি মন্দ নয়।

অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে মন্দিরার মূল্যায়নে বসলেও একসময় মনে মনে অনুভব করল তপন মন্দিরা সম্বন্ধে ভাবনাটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে। নিজের মূল্যায়নটা বেঠিক হয়ে যাবার ফলেই বোধহয়। মন্দিরা যদি ওকে পাত্তা দিয়েও থাকে সেটা ওকে নয়, মুখোসকে। যে যে গুণের নামাবলী গায়ে ও অফিসে ঢুকেছে মন্দিরা আকৃষ্ট হয়েছে সেই নামাবলীর জলুসে। ওর সব পরিচয় জানলে মন্দিরা ওকে নিশ্চয়ই চায়ের

আমন্ত্রণ জানাত না। হেসে হেসে এত মিষ্টি কথা বলত না। এ যুগের কথকতা নির্বাচিত ভক্তদের জন্য। ধনমান নির্বিশেষে নয়। এ যুগের মন্দিরাদের কথা সূক্ষ্মমুদ্রার কথাকলি, চিনুদের মত মুক্ত গ্রামের কথার পাঁচালী নয়।

চিনুর কথায় মনে পড়ল সিনেমার কথা। বলার সময় যতটা উৎসাহ অনুভব করেছিল এখন সে উৎসাহ নেই। তবু প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করা উচিত। কাকীমার দাপটে কোন সখসাধ মেটে না মেয়েটার। আজকের ছুটিটা কাজে লাগালে মন্দ হয় না।

ইতু চা নিয়ে আসে। তপন তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে।

—বাঁচিয়েছিস। সুখে শান্তিতে বেঁচে থাক। নিজের চেষ্টায় ভাল ঘর-বর হোক।

ইতু যেতে যেতে হেসে বলল, শুনে খুসী হবে সে-চেষ্টার সঙ্গে একটি ভাল বৌ আনার চেষ্টাও চলছে।

কিন্তু ঘণ্টা কয়েক বাদে ইতুর বিনা চেষ্টায় এবং অজ্ঞাতে যে অমন কৌতুককর পরিস্থিতির ভেতর একটি হবু-বধূর সংবাদ আসবে তা ভাবতেও পারেনি তপন।

তপন ভেতর বাড়ীতে জ্যোতির সঙ্গে গল্প করছিল। অফিসের সব মজার মজার গল্প। আর কান পেতে ছিল ওপর তলার অনুরোধের আসরের দিকে। আসরের প্রতি কোন আকর্ষণ থেকে নয়। আসরটা ভাঙ্গলে সময় হয়েছে বুঝে সিনেমার জন্য উঠবে, তাই। অনুরোধের আসরে জীবনে একবার মাত্র একটি অনুরোধ জানিয়েছিল তপন, রেডিও না থাকলেও, অনুরোধের আসরটি তুলে দেবার অনুরোধ। জীবনের বহুক্ষেত্রে বহু অনুরোধের মতই সেটা উপেক্ষিত হয়েছে। অবশ্য এতে ক্ষোভ নেই ওর। মাঝে মাঝে ঘড়ি না থাকলেও সময় মাপা যায় এই আসরটা দিয়ে। সেটাই লাভ।

অফিস-দিনের পোটা গলিটার মতই স্বপন ঘুমঘুম আমেজে শুয়ে

ছিল। বোধহয় কিছুটা তন্দ্রাও এসেছিল। এমন সময় জানলার কাছে অসম দুই বৃদ্ধের আগমন। বার কয়েক জানলা দিয়ে ডেকেছিল বোধহয়, সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একজন উৎসাহের প্রাবল্যে জানালা দিয়ে ছাতা গলিয়ে খাটে শব্দ করে ডাকল ওকে, এইযে ভাই, শুনছেন।

এতেও না শোনার মত গভীর ছিলনা ঘুম, চোখ মেলল স্বপন।

নিদাঁত মুখে একগাল বৈদান্তিক হাসি হেসে ছত্রপতি বললেন, কিছু মনে করবেন না, একটু বিরক্ত করলাম।

এই সরল স্বীকারোক্তিতেও বিরক্তি কমলনা স্বপনের। হাসি ফেরত না দিয়েই গম্ভীর মুখে বলল, কাকে চান ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বিগলিত হলেন এবার, এটাই দশ নম্বর বাড়ীতো ?

স্বপন উঠে বসতে বসতে বলল, নাকের ডগাতেই তো লেখা আছে দেখছেন।

বৃদ্ধ আবার হাসলেন, দেখছি; তবু একটু নিঃসংশয় হলাম। আমরা স্বপনবাবুর কাছে এসেছিলাম।

স্বপন এবার সচেতন হল। দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়-স্বজন কিনা কে জানে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল।

—আসুন, ভেতরে আসুন। আমিই স্বপনবাবু। কি দরকার বলুন তো।

বৃদ্ধ দুজন ভেতরে এলেন। প্রথম জন কালো, মোটা। আঘাড় বিস্তৃত টাক। দ্বিতীয় জন কৃশ, রক্তহীন শ্বেত এবং বৈদান্তিক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল স্বপন।

দুজনেই ঘরে ঢুকে নমস্কার করলেন স্বপনকে। স্বপনের খাটের উপরই বসলেন। বৈদান্তিক দ্বিতীয় জনকে ঠেললেন, বল হে বিকাশ, তুমিই

হাসি পেল স্বপনের। নামটা পাল্টে এখন বি-কেশ করা উচিৎ।

বিকেশ একটু লজ্জার হাসি হাসলেন।—বলনা হে, তুমিই বল।

ওদের অনুরোধের প্রতিযোগিতার সামনে উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্বপন। অবশেষে বিনয়ের সঙ্গে বৈদান্তিকই শুরু করলেন, আমরা আপনার কাছেই একটা কাজে এসেছিলাম স্বপনবাবু।

—আমার কাছে? বলুন।

—মানে, ঠিক আপনার কাছে নয়, আপনি-ঘটিত একটা কাজে।

স্বপন অবাক হল।—আমি-ঘটিত!

বৈদান্তিক একবার হাত কচলালেন, আপনার অভিবাবক কে?

স্বপন একটু হাসল, আমি তো নাবালক নই, আমাকেই বলুন না।

বিকেশ এবার নিজেই লজ্জায় মাথা চুলকালেন, আপনি হয়তো লজ্জা পাবেন, তাই—।

স্বপনের কেমন যেন সন্দেহ হল। বলল, লজ্জা পাব কেন? বলুন না।

অগত্যা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলতে হল বৈদান্তিকের, বাবাজীর একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিলাম, মানে, প্রস্তাব।

আকাশ থেকে পড়ে স্বপন, প্রস্তাব!

বিকেশ ততক্ষণে মুখস্থ বলতে শুরু করে দিয়েছেন, মেয়েটি বাবা প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, সচ্চরিত্রা, বয়স অনুমান—

বাধা দিল স্বপন, আপনারা প্রথম অনুমানেই ভুল করেছেন। বিভিন্ন কারণে আমার বিয়ের কথাই উঠতে পারেনা এখন। আপনারা বোধহয় ভুল শুনে এসেছেন: তাছাড়া, এমন বেকার পাত্রটির খোঁজ কে দিল আপনাদের বলুন তো।

বৈদান্তিক অনেক বেশী পোক্ত ব্যক্তি। অত সহজেই পিছু হটবার লোক নন। হেঁয়ালী হেসে বললেন, অত সহজেই কি ফাঁকি দিতে পারবেন ভায়া। আপনার অফিস থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নিয়ে তবে এসেছি।

দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ল স্বপন, আমার অফিস!

তপনেরই কপাল বলতে হবে, ঠিক সময়মত জ্যোতি এসে হাজির। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যেটুকু শুনেছে তা থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে

পেরেছিল জ্যোতি। বৃদ্ধদ্বয়ের বিগলিত চেহারার ওপর চোখ বুলিয়ে স্থির নিশ্চিত হল এবার। এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে স্বপনকে বলল, বুঝেছি, দাদা বলে ভুল করেছে তোকে। ঠিক আছে, তুই দাদাকে একটু পাঠিয়ে দে।

স্বপনের সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে এসে আবার ফিস-ফিস করে বলল, দাঁড়া, সমূলে উৎপাটন করছি। তুই আর এদিকে আসিস না। তপুদা আর আমিই যথেষ্ট।

স্বপন বেরিয়ে গেলে হাসতে হাসতে। এগিয়ে এল জ্যোতি।

—আপনারা কেন এসেছেন বুঝেছি। ও ভীষণ লাজুক। তাছাড়া বিয়ের কথা শুনলেই চটে যায়। ওর দাদাই ওর অভিবাবক। তার সঙ্গেই কথা বলে যান।

বোধহয় স্বপনের কাছে কিছুটা শুনে এসেছিল তপন। ঘরে ঢুকল বেশ ভারিক্কি চালে। নমস্কার করে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো?

দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। তারপর বিগলিত হয়ে বৈদান্তিক বললেন, আমরা একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছিলাম।

তপন বাধা দিল, না না, এতে বিরক্ত করার কি আছে। এতো শুভ প্রস্তাব। মেয়েটি কার?

এবার বিকেশ বিগলিত হলেন, এবং আবার গড়গড় করে মুখস্থ বলতে শুরু করলেন, আমার। মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, সচ্চরিত্রা, বয়স অনুমান—

তপন মাঝপথেই বাধা দিল। একটু চিন্তিত ভাবে বলল, দেখুন, আপনাদের সঙ্গে তাহলে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করাই ভাল। এসব বিষয়ে কোন লুকোচুরি ঠিক নয়। পাত্র—

বৈদান্তিক গর্বের সঙ্গে বললেন, পাত্র প্রসঙ্গে পাত্রর অফিস থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নিয়েই এসেছি দাদা। ও বিষয়ে আপনার কিছু বলার দরকার নেই।

তপন গম্ভীর স্বরে বলল, পাত্র সম্বন্ধে নয়, পাত্রর মতামত সম্বন্ধে

বলছিলাম। ওর মতটা একটু প্রয়োজন। আজকালকার দিন, বোঝেনইতো দাদা, একটি মেয়ের সঙ্গে ওর একটু ইয়ে আছে শুনেছি, তাই—।

বৈদান্তিক ঠিক না বুঝেই বলে ফেললেন, আরে দূর তাতে কি হয়েছে ও একটু ইয়ে—।

কিন্তু কন্যাটি বিকেশের বলেই বোধহয় উনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। —ইয়ে, মানে, আপনি ঐ সব ইয়ের কথা বলছেন?

তপন লজ্জায় মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ইয়েই।

বৈদান্তিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন বিকেশ।

—ছি ছি ছি, আপনি অভিভাবক হয়ে একথা এমন অবলীলাক্রমে বলতে পারলেন? ইস্, আগে জানলে কোন শালা সেই আমতা থেকে বাগবাজারে ঠেঙ্গিয়ে আসত। আচ্ছা, আসি দাদা, নমস্কার।

জ্যোতি শেষ পর্যন্ত হাসি না চাপতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপন হাত জোড় করে একটু এগিয়ে এল, অপরাধ নেবেন না। দয়া করে একটু চা খেয়ে গেলে—।

বৈদান্তিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দুপা এগিয়েই আটকে গেলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আবার চা কেন, কষ্ট করে আবার চা—।

—সর্বেশ্বর!

বিকেশের প্রচণ্ড ধমকের আঘাতে চেতনা ফিরে এল বৈদান্তিকের। প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, অসম্ভব, কিছুতেই চা খাব না এখানে। যা ব্যবহারটা করলেন।

উত্তেজিত ভাবে গমকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বিকেশ ও বৈদান্তিক। হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল জ্যোতি।

কন্যার পিতাকে দায়মুক্ত করে সিনেমা হল্-এ আসতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। কাছে এসে ভয়ে ভয়ে হলের দিকে তাকাল তপন। না 'হাউস ফুল' ঝোলেনি এখনও। একমাত্র মহিলা শ্রেণী পূর্ণ হয়েছে।

ছবির শ্রেণী বিচারে মহিলারা উদার বলেই বোধহয় সব হলেই ঐ শ্রেণীটা সর্বপ্রথম, এবং প্রায় প্রতিদিন, পূর্ণই থাকে। নির্ভয় তপন চিন্নুকে অপেক্ষা করতে বলে টিকিট কাটতে গেল। টিকিট কেটে চিন্নুর সামনে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ উলটা দিকে চোখ পড়ল। ভূত দেখার মত মনে মনে চমকে উঠল তপন। মন্দিরা! সঙ্গে এক সুবেশ ভদ্রলোক। মন্দিরাও বোধহয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল। তারপর একটু হেসে সঙ্গের ভদ্রলোককে কি যেন বলে এগিয়ে এল সামনে।

মনে মনে ততক্ষণে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে তপন। ন্যায়-অন্যায় যে কোনরকমে হোক সাময়িক আত্মরক্ষা প্রয়োজন। এবং সে জন্য প্রথম প্রয়োজন সরল চিন্নু ও সন্থবে মন্দিরার ভেতর দীর্ঘতম ব্যবধান রচনা করা। সুতরাং একটু অপেক্ষা করতে বলে তপনও হেসে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

—আরে, কি খবর? আপনিও ডুব দিয়েছেন আজ? আশ্চর্য যোগাযোগ কিন্তু না?—চাপা উচ্ছ্বাস মন্দিরার স্বরে।

তপন আতঙ্কটা তখনও পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবু একটু হেসে বলল, জীবন থাকলেই তার যোগবিয়োগ থাকবেই। বইয়ের দোকানের কিছু বাকী টাকা আদায়ের কাজ ছিল বলে অফিসে গেলাম না আর। এই বইয়ের দোকানই আমাকে খেল।

মন্দিরা সহানুভূতির স্বরে বলল, শরীরের দিকেও একটু নজর দেবেন। আপনার খুব খাটতে হয় মনে হয়।

শরীরের দিকে নজর দেওয়া এবং সিগারেট খাওয়া কমান—এ দুটো অনুরোধ মেয়েদের মনের দর্পণ। মনে মনে এত আতঙ্কের ভেতরও এতে খুসী হল তপন।

মেয়েরা যে কয়টি ক্ষেত্রে দমন-নীতি পছন্দ করেন না, কৌতূহলটা তার ভেতর একটি। মন্দিরাও শেষ পর্যন্ত সেটা দমন করার চেষ্টা করল না। সরল ভাবেই জিজ্ঞেস করল, সঙ্গের ভদ্রমহিলা কে?

—কেন; দেখে চিনতে পারছেন না?—অবাক হয় তপন।—

সকলেই তো বলে আমাদের ভাই-বোনদের দেখলেই ভাই-বোন বলে চেনা যায়।

বোন শুনে উৎসাহিত হয় মন্দিরা। একটু হেসে বলে, ঠিক বুঝছি না। কৈ, আলাপ করিয়ে দিলেন না তো!

মুহূর্তে কালো হয়ে যায় তপনের মুখ। মাথা নিচু করে। তারপর গভীর দৃষ্টিতে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বলে, শুনলে দুঃখিত হবেন, দুতিন বছর আগে টাইফয়েডে কালা হয়ে গেছে ও, কানে শুনতে পায় না।

লজ্জিত হয় মন্দিরা।—সরি, আমি ঠিক জানতামনা। তাহলে সিনেমা কি করে—।

মাঝখান থেকেই কথাটা লুফে নেয় তপন।—শুধু দেখে যায়, শুনতে পায়না। বলে, একটা কথা না বুঝেও তো অনেকে ইংরেজী বই দেখে, সেই রকমই দেখব না হয়। স্রেফ নেশার জন্য দেখে যায়।

সহানুভূতিতে নরম হয়ে ওঠে মন্দিরার দৃষ্টি। তপন সুযোগ বুঝে বলে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন বোধহয় ভদ্রলোক।

—ও হ্যাঁ, যাই তাহলে।—সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মন্দিরা। একটু হেসে বলে, আমাব পিসতুতো ভাই। নতুন কলকাতায় এসেছে। বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে ছবির সমাপ্ত পর্যন্ত না দেখতে পারলেই আবার মন খারাপ হবে। যাই।

তপন ফিরে আসে চিন্ময়ের কাছে। চিন্ময়েরও সর্বপ্রথম কথা, মেয়েটি কে?

তপন হলে ঢুকতে ঢুকতে নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দেয়, আমাদের বইয়ের দোকানের টাইপিষ্ট। দেখে বুঝতে পারলে যে বিবাহিতা উনি? স্বামীর সঙ্গে এসেছিস একটু মাথার ওপর কাপড়টা টেনে দিলেই বা দোষ কি!

মন্দিরা ফিরে এলে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করার আগেই নিরসভাবে বলল, আমাদের স্যাকরার ছেলে। ওর বাবা সেই যে ইয়ার[illegible] নিয়েছে সারানোর জন্য আর দেবার নাম নেই। তাগাদা দিয়ে এ[illegible]

ততক্ষণে প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গিয়েছে। সামান্য সময়ের ও দুটো সারির ব্যবধানে ওরা আধো অন্ধকারে গিয়ে বসল। অবশ্য কেউ কাউকে দেখতে পেলনা।

ইণ্টারভেলের সময় ভাল করে আলো জ্বলার আগেই হল থেকে বেরিয়ে এল তপন। এক কোণে গিয়ে একটি সিগারেট বের করল পকেট থেকে। কিন্তু দেশলাই বের করে দেখল কাঠি নেই। পাশে তাকিয়ে দেখল মন্দিরার দাদা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। অবশ্য তপনকে ভীড়ের ভেতর ঠিক লক্ষ্য করেন নি। একটু ইতস্তত করেও তপন কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, একটু আগুনটা দেবেন?

ভদ্রলোক চিনলেন তপনকে। পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন, নীচে দড়িতে আগুন আছে। ধরিয়ে আন।

অপমানে কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল তপনের। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, সেটা দেখিয়ে না দিলেও চলত। কষ্ট করে এটুকু ভদ্রতা না করলেও পারতেন।

অত্যন্ত কষ্টে, বহু টাকা ও সময়ের কাঠখড় পুড়িয়ে উপার্জিত আভিজাত্যের সত্বটা আস্তে আস্তে ভদ্রলোকদের হাত থেকে ছোটলোকদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে যাদের দিনের খাওয়া, রাতের ঘুম প্রায় লোপাট হবার যোগাড়, বর্তমান ভদ্রলোক ছিলেন সেই দলভুক্ত। এমনিতেই স্যাকরার ছেলের সাজগোজ করে মেয়ে নিয়ে সিনেমায় আসাটা, এসেও তাদের সঙ্গে একই ক্লাশে বসে সিনেমা দেখাটা বরদাস্ত হয়নি তাঁর। তার ওপর মন্দিরার সঙ্গে ওর আলাপেও যেন যথেষ্ট বিনয়ের অভাব ছিল। তাই মেজাজটা প্রথম থেকেই খারাপ ছিল। এবার তীব্র ব্যঙ্গে বললেন ভদ্রলোক, তাই নাকি, এখন দেখছি নতুন করে ভদ্রতার পাঠ নিতে হবে আবার স্যাকরার ছেলের কাছে।

শাট্ আপ, কাকে আপনি স্যাকরার ছেলে বলছেন জানেন!— [illegible] চীৎকার করে ওঠে তপন।

ভদ্রলোক এবার একটু থতমত খেয়ে যান। বললেন, কেন, আপনি মিস্ মিত্রদের স্যাকরা নন?

মিস্ মিত্র! হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হয় তপনের। অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, মিস্ মিত্র! উনি আপনার মামাতো বোন না?

—মামাতো বোন!—বিস্ময় ফোটে ভদ্রলোকের স্বরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হলের ভেতর অভিনীত হচ্ছিল একই নাটকের আর এক দৃশ্য।

দু'তিনবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চিনু, মেয়েটি একাই বসে আছে। স্বামী ওর বাইরে গেছেন বোধহয় সিগারেট খেতে। হাজার হলেও স্বল্প শিক্ষিতা গ্রামের মেয়ে চিনু। সহজাত মেয়েলি বৃত্তিগুলোকে রং-চং মাখিয়ে বহুরূপী করে রাখতে অভ্যস্ত নয় ও। ব্যবহারে সহজ। বারে বারে মেয়েটি সম্বন্ধে একটা মেয়েলি কৌতূহল খোঁচা দিতে লাগল ওর মনে! অদম্য ইচ্ছে হল ওর সঙ্গে গিয়ে একটু আলাপ করতে। কয়েকবার চোখাচোখিও হল ওর মন্দিরার সঙ্গে। একটু হাসল ও। কিন্তু কোন প্রতি-হাসি পেল না মন্দিরার তরফ থেকে।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে উঠে এল ও মন্দিরার কাছে। এসে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম ভাই। আপনি বুঝি তপনদার সঙ্গে কাজ করেন?

মাথা নাড়ল মন্দিরা।

—আপনি কোথায় থাকেন?

চুপ করে থাকল মন্দিরা। মনে মনে রাগ হল, কানে শোনেনা অথচ আলাপ করার সখ কেন বাবা।

চিনু জিজ্ঞেস করল আবার, আপনি কোনদিকে থাকেন?

মহা বিপদে পড়ল মন্দিরা। বলতে হলে তো চীৎকার করে বলতে হয়। সমস্ত হলের সামনে সে এক হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করা। চুপ করেই থাকল তাই।

চিনু এবার চটে গেল। দেখুন, অত দেমাক ভাল নয়, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তখন থেকে, ভদ্রতা করেও তো লোকে উত্তর দেয়

আশে পাশের দু'চারজন বেশ কৌতুক অনুভব করছিল এতে। তাদের শুনিয়েই এবার একটু নড়ে চড়ে বসল মন্দিরা, নাঃ, এ কালাকে নিয়ে তো বিপদে পড়লাম।

—কালা! কি যা তা বলছেন। কে বলল আপনাকে আমি কালা!—রাগে কাঁপতে থাকে চিনু।

বিস্মিত হয়ে চিনুর দিকে ফিরে তাকাল এবার মন্দিরা।—মাপ করবেন, আপনি কানে কম শোনেন না?

গ্রামের মেয়ে বলেই রাগের ওপর মিষ্টি হাসির প্রলেপ দেবার আর্ট জানা নেই ওর। জিভেও ধার তাই অনেক বেশি। মন্দিরাকে পাত্তাই দিলনা ও। নিজের তাগিদেই বলে চলল, থাক হয়েছে, আর ঠাট্টা করতে হবেনা। অশিক্ষিত হলেও ঠাট্টা বুঝি আমরা। নেহাৎ আপনার স্বামী বাইরে গিয়েছেন দেখে একটু আলাপ করতে এসেছিলাম, নাহলে গায়ে পড়ে আলাপ করতে বয়ে গেছে আমার! কে বলেছে আপনাকে আমি কানে কম শুনি?

—আমার স্বামী! আমার স্বামী কে বলল?—আবার অবাক হয় মন্দিরা।

—কেন, তপনদা বলল আপনার স্বামী উনি!

ঝট করে উঠে দাঁড়াল মন্দিরা, বসুন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আর আপনার তপনদাই বলেছিল আপনি কানে কম শোনেন।

—আপনার স্বামী নন তাহলে উনি?—আন্দাজে বোঝে চিনু তপনের খোঁজেই যাচ্ছে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে। চারপাশের কৌতূহলী চোখের জিজ্ঞাসা সরিয়ে এগিয়ে গেল ওরা দরজার দিকে।

কিন্তু দরজা পেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরা। সাপের মাথায় যেন মন্ত্রপড়া ধুলোপড়ল।

তপন আর সমীরদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই চোখেমুখে কৌতূহল, বিস্ময়, রাগ।

ওদের দেখেই তপন দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিগারেট ধরাতে। আর মন্দিরা দ্রুতপায়ে ফিরে এল অন্ধকার হলের ভেতর।

কিছুক্ষণ সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল চিনু আর সমীর। দু'একবার চোখাচোখিও হল। তারপর দুজনেই বিহ্বলের মত হলে ফিরে এল।

তপন এল আরো খানিকক্ষণ পর। বসেই বলল, কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। ওদের সঙ্গে আর দেখা করার প্রবৃত্তি নেই আমার। শেষ হলেই আমার সঙ্গে ডানদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে কিন্তু। পরে সব বলব।

সব কিছু তালগোল পাকিয়ে-ফেলা চিনু সিনেমা ভাঙতেই ঠিক তাই করল।

আট

পরদিন অফিসে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তপন। যতদূর সম্ভব মন্দিরাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগল। নিজের সিট এড়িয়ে বাইরে বাইরে কাটাবার চেষ্টা করতে লাগল।

কাল সারারাত ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। ঝোঁকের মাথায়, কিছুটা আত্মরক্ষার জন্যই, খুব বেশী ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল সিনেমা হলে। অবশ্য ঘটনাটা অমন বিসদৃশ আকার ধারণ করবে ঠিক ভাবতে পারেনি আগে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটার পর শুধু লজ্জিতই হয়নি ও, কিছুটা আত্মধিক্কারও বোধ করেছে। বারে বারে অনুতাপ হয়েছে, কেন স্বেচ্ছায় এ কাঁচের ঘরে ঢুকতে গেল। মিথ্যেটাকে জীবনে যতই অপছন্দ করে, ততই যেন পাকে পাকে মিথ্যে জড়িয়ে ফেলছে। একটা মিথ্যে ঢাকতে দশটা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অথচ এসবের কোন প্রয়োজন হত না যদি ও ওর সত্যি মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। তা হয়নি, হবার নয়। পরিবেশই বাধ্য করেছে ওকে এ পথ বেছে নিতে। এবং বোধহয় সেটাই শেষ সান্ত্বনা, ও নিজের

স্বার্থে এ মিথ্যের জাল বুনছে না। এ আত্মনিগ্রহের ভেতর দিয়ে আর দশজনের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে।

অনেক কষ্টে, অজস্র মিথ্যে কথার ফুলঝুরিতে কোন রকমে সামলিয়েছে কাল চিনুকে। অবশ্য সন্দেহ আছে, চিনু সত্যিই সব কথা বিশ্বাস করেছে কিনা। এখন সমস্যা মন্দিরা। মন্দিরাকে কি অত সহজে ভোলান যাবে। তাগিদটা মন্দিরাকে ভোলানোর জন্যই নয়, নিজের আত্মমর্যাদার সঙ্গে প্রশ্নটা জড়িত বলে। অবশ্য ধাপ্পাতো মন্দিরাও দিয়েছিল। কেন?

ফাঁকা ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে নতুন করে কথাগুলো আবার ভাবছিল তপন। কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছিল, এর চেয়ে অল্প মাইনেরও একটা স্থায়ী চাকরী বাকরি যোগাড় করতে পারলে এ পাট চুকিয়ে দিত। মনের ওপর বড় বেশী চাপ পড়ছে।

ওকে সিটে না পেয়ে বেয়ারা ক্যান্টিনে এসে হাজির হল।

—সাহাব আপকো সালাম দিয়া।

সিটে গিয়ে একটা জরুরী ফাইল নিয়ে সাহেবের ঘরে গেল তপন। কয়েকটা সই বাকী ছিল সাহেবের।

ঘরে ঢুকে ফাইলটা টেবিলে রাখতেই একটু হাসলেন মিঃ রাহা, এই দেখ; ফাইল ছাড়া বুঝি আপনাকে অন্য কাজে ডাকা যায় না। বসুন।

বসল তপন। এবং এতক্ষণে মনে পড়ল, সকালে এসেই সেই ফরাসী সাহিত্যের প্রবন্ধটা দিয়ে গিয়েছিল, বোধহয় সেটার জন্যই ডেকেছেন।

মিঃ রাহা কি যেন একটু ভেবে চোখ তুলে বললেন, জানেন বোধহয় আপনার লিটেরারী টেস্টের জন্যই কেমন যেন একটা টাই ফিল করি আপনার সঙ্গে। কেরানীদের ভেতর এটা খুব রেয়ার কিনা।

তপন সায় দিল, সেতো নিশ্চয়ই স্যার। তাছাড়া এসব অফিসারদের কোয়ালিটি কেরানীদের কাছে আশা করাও যায় না। প্রবন্ধটা পড়ে দেখেছেন?

হ্যাঁ, একবার আলগা ভাবে চোখ বুলিয়েছি। বেশ ভাল লাগল। অবশ্য ছোট দুএকটা পয়েন্ট বাদ পড়েছে মনে হচ্ছে, ও টুকু আমি ঠিক করে নেব।

চেপে ধরলে যে আর আধখানা পয়েন্টও নতুন বের করতে পারবেন না সেটা বেশ জানে তপন, তবু এ ব্যাপারে কথা বাড়াতে ভয় পায় নেহাৎ কাঁচের ঘরে বাস করছে বলেই।

মিঃ রাহা অন্যমনস্কে পেপার ওয়েটটা ঘোরাচ্ছিলেন। আরো কিছু বক্তব্য, এবং গভীর বক্তব্য আছে বলে মনে হল তপনের। আর সেই মৌন মুহূর্তগুলো অস্বস্তি বাড়াতে লাগল।

একটু বাদে পেপার ওয়েটটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার চোখ তুলে তাকালেন মিঃ রাহা। তারপর একটু ইতস্তত করে সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনার সঙ্গে একটা বিষয় একটু আলোচনা করব বলে ভাবছিলাম।

তপন বিনয়ের সঙ্গে বলল, বলুন।

মিঃ রাহা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন, বসুন না।

তপন বসল। মিঃ রাহা চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ বন্ধুত্ব-পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বি,এ-তে আপনার কি কি কম্বিনেশন্ ছিল?

এ আচমকা প্রশ্নে তপন হঠাৎ একটু হকচকিয়ে গেল। কোন রকমে তাল সামলে বলল, সে অনেক, মানে, ইকনমিকস্--

—ইকনমিকস্! মিঃ রাহা বেশ খুশি হলেন, ব্যাস্ ব্যাস, আর বলতে হবে না।

তপন ঘাবড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ইকনমিকস্ এর বিশদ আলোচনায় বসবে নাতো আবার! তাহলেই সেরেছে! এই আবার শুরু হল যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রয়োজন!

মিঃ রাহা একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ সহজ হয়ে বসে, কোন অফিস ফাইল সম্বন্ধে যেন বলছেন এমন স্বচ্ছন্দ স্বরে বললেন, দেখুন আমার মেয়েটি আই-এ পড়ে। সেদিন বলছিল ইকনমিকস্ পোরসনটা

একেবারেই মাথায় ঢুকছে না। আপনি মাঝে মাঝে ওকে একটু হেলপ্ করতে পারেন? ওর দাদুর অবশ্য ইচ্ছে ছিল প্রফেসর রেখে দেবার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি এসবদিকে একটু রক্ষণশীল! বাইরের লোক রেখে পড়ানোটা আমি খুব লাইক্ করিনা।

তপন সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করল, সেতো নিশ্চয়ই। তাছাড়া নিজেদের ভেতর পেলে বাইরের লোকের দরকার কি। আর চাকরি করতে এসে তো ওসব প্রায় ভুলে যাবার সামিলই হয়েছে, একটু চর্চ্চার ভেতর থাকলে আমারও উপকার।

মিঃ রাহা উৎসাহিত হলেন, বাইট্ ইউ আর। পড়াশুনাটা বেচাকেনার জিনিস হয়ে উঠলে ওটা আর বিদ্যে থাকেনা, বাজার হয়ে ওঠে। আপনাকে রোজ যেতে হবেনা। এই মাসে মধ্যে মধ্যে দু'এক দিন আপনার সুবিধে মত—।

—কখন গেলে সুবিধে হয় ওঁর।

মিঃ রাহা তপনের কথা শুনে যাৎপরনাই সঙ্কুচিত হলেন, আরে ছি ছি, ওঁর ওঁর করছেন কেন? একেবারে ছেলেমানুষ ছোট বোনের মতই দেখবেন ওকে। আর সেজন্যই বিশেষ করে আপনাকে বলা। সবাইকে তো আর বিশ্বাস করে এসব ভার দেওয়া যায়না। সন্ধ্যার পর বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে এই একটু ঘুরতে ঘুরতে গেলেই হবে দু'একদিন।

তপন জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ী বেহালায় তো? নাম্বারটা কত?

মিঃ রাহা এবার স্নেহের হাসি হাসলেন।—পাগল নাকি? অতদূর হলে কখনো বলতাম আপনাকে? আমার নিজের একটা বিচার নেই। আপনাদের ওদিকেই থাকে। মামাবাড়ী থেকে পড়ে। দাদুর ভীষণ আদুরে কিনা। আমি আমার শ্বশুর মশায়কে আপনার সম্বন্ধে সব বলে এসেছি। আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, যে কোনদিন গিয়ে আলাপ করে নেবেন। আমারই অবশ্য নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে

দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কটা দিন আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকছি। তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো আর ফর্মালিটিজের কোন—

—না না, কোন প্রয়োজন নেই।—সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় তপন আমি নিজেই আলাপ করে নেবখন। চিঠিটা তাহলে—।

মিঃ রাহা ড্রয়ার টানলেন।—আমি লিখেই রেখেছি। আমি জানতাম এসব লেখাপড়ার ব্যাপারে আপনার মত সত্যি শিক্ষিত ছেলেদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে এল তপন। এবং বেরিয়ে এসেই মনে হল, ব্যাস, খেল্ খতম। কাল থেকে আর আসতে হবে না এখানে। আজই এ অভিনয়ের শেষ রজনী। আগে জানলে এ ফাঁদে পা বাড়াতনা। অফিসে একজন অফিসার থাকবেনই, এটা জানত ও। কিন্তু তার যে আবার সাহিত্য-প্রীতি থাকতে পারে, ইকনমিকস্-পড়া মেয়ে থাকতে পারে—এসব একবারও মাথায় আসেনি ওর। চারদিকে তাকিয়ে মনটা এবার খারাপ হয়ে গেল তপনের। এই প্রথম অনুভব করল, কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল এ কদিনেই অফিসটার ওপর। বাঁধা স্টেজের ওপর অভিনেতার আকর্ষণের মত।

চেয়ারে এসে বসতেই ঢং ঢং করে বারোটা বাজল ঘড়িতে। সচেতন হয়ে উঠল তপন। আর এতক্ষণে খেয়াল হল, পাশের ব্রজেনদা একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে ডাকছেন ওকে।

তপন তাকাতে ভদ্রলোক বললেন, কি ভাই তখন থেকে ডাকছি কানেই যাচ্ছেনা যে। কি ভাবছেন অত?

অন্যদিন হলে গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে ফাইলটি নিত তপন। বিনা বাক্যব্যয়ে। কিন্তু আজ তপন যেন অন্য তপন। একটু হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ভাবছি বারোটা বেজে গেল।

ব্রজেনদা একটু অবাক হলেন। বোধহয় কিছুটা সাহসও পেলেন। ঠিক মল্লিকা দেবীর ঘরের পাশে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ঘড়িটার দোষই ঐ, নজর পড়লেই বারোটা বেজে যায়।

শান্তিবাবু ওদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, একটু অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকালেন। তপন হঠাৎ ডেকে বসল, এই যে শান্তিবাবু, দেশলাই আছে ?

শান্তিবাবুর মুখে খুশি বা অখুশি কিছুই ঠিক ফুটল না। দেশলাইটি এগিয়ে দিতে দিত বলল, সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছে ভাবছি।

তপন সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলল, সূর্য ঠিকই ওঠে দাদা, মাটির সঙ্গে মিতালির ইচ্ছেও তার থাকে ; কিন্তু মাঝে মাঝে গোলমাল করে বিরক্তিকর মেঘগুলো। ধরুন না কেন মেঘ কেটে গেছে।

শান্তিবাবু কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। শুনল তপন, একটি ছেলে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার, কেমন ধোঁয়াটে ঠেকছে না ?

শান্তিবাবু ঠোঁট উল্টে বললেন, কি জানি, ফরাসী মেজাজ কিনা, বোঝা ভার।

কাজে মন লাগছে না, একটু ঘুরতে বেরুল তপন। কেরাণী জীবনের স্বাদ পেল কিন্তু ফাঁকি দেবার স্বাদটা পায়নি এতদিন, সেটুকু আব বাদ থাকে কেন। শেষের দিনটা কাজে লাগান যাক।

অফিসের বিরাট বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে বেড়াল তপন। নিরাসক্ত দর্শকের মত ব্যস্ত কেরানী-বেয়ারাদের ছুটাছুটি দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আর হাসতে হাসতে বিরাট একটা জটিল প্রশ্ন মনে এল ওর। আমরা বাঁচার জন্য চাকরি করি না, চাকরি করার জন্য বাঁচি। প্রশ্নটা ভাবতে ভাবতেই খেয়াল হল, টিফিনের সময় না হলেও তার ভূমিকা শুরু হয়ে গেছে। সাধারণত অফিসে অন্য সময়টা তবু কোনরকমে কাটায় তপন, কিন্তু বিপদে পড়ে টিফিনের সময়। আশেপাশের সরব আলোচনায় যোগ দেবার দুর্বার আকর্ষণ থেকে প্রাণপণে টেনে রাখতে হয় নিজের আড্ডাবাজ সত্তাটাকে।

মাঝে মাঝে অবশ্য দু'চারজন সহকর্মী নিজে থেকেই এগিয়ে আসে আলাপ করতে, কিন্তু ফিরে যায় ওর গাম্ভীর্যের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

কোন কথারই স্পষ্ট জবাব দেয়না তপন। পাশ কাটিয়ে যায় আবছা উত্তরে।

নিঃশব্দে বসে বসে শোনে চা-বাসরের আলোচনা। সুচিত্রা-উত্তম আর ফুটবলের প্রথম ব্রাকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ তার অধিকাংশ। মাঝে মাঝে প্রথম ব্রাকেট থেকে কিছুটা হয়তো রাজনীতির উত্তাপে গলে বেরিয়ে আসে বাইরে, কিন্তু সেখানেই দ্বিতীয় ব্রাকেট এসে পথ রোধ করে। তৃতীয় ব্রাকেট পর্যন্ত আলোচনাটা এগোতে দেখলনা তপন একদিনও।

কিন্তু আজ বেশ উৎসাহ নিয়েই গেল তপন টিফিন রুমে। এক কাপ চা নিয়ে জাঁকিয়ে বসল। পরিচিত কয়েকজনকে ডেকে বসিয়ে সহজ সুরে আলাপ করল। অবাক মুখগুলোর ওপর ওর এই আচমকা পরিবর্তনের ফলাফল পাঠ করে মনে মনে প্রচুর কৌতুক অনুভব করল। তারপর টিফিন শেষ হবার আগেই হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাবুর কথা মনে পড়ায় ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেল।

অটুট মনোযোগ সহকারে একটা সিনেমার পত্রিকা পড়ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। তপনকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আসুন, আসুন, কোন কাজের জন্য কি?

—কেন, কাজ ছাড়া আপনার কাছ আসা নিষেধ বুঝি?—একটু হাসল তপন, কাজটাজ ভাল লাগছেনা। একেবারেই ছেড়ে দেব ভাবছি। তারপর, কি পড়ছেন?

একটু লাজুক হাসি হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, এই সুচিত্রার জীবনীটা পড়ছিলাম। অবশ্য ওর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। আমার পিসতুতো বোনের ননদের ভাইয়ের শালী সুচিত্রার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড কিনা।

. তপন উৎসাহিত হল, তাই নাকি? ওঃ, ইউ আর লাকি ইনডিড্!

শ্রীকৃষ্ণবাবু একটু হেঁ হেঁ করে হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস

করলেন, কাজ ছেড়ে দেবেন মানে, অন্য কোথায়ও কিছু পেয়েছেন বুঝি? তা আপনারা কোয়ালিফাইড্ লোক—।

তপন বাধা দিয়ে বলল, না, কাজ টাজ পাইনি কিছু। এমনিতেই ভীষণ টায়ার্ড মনে হছে। আচ্ছা ইচ্ছে হলে রেজিগনেসন্ লেটার কি কর্তৃপক্ষ মেনে নাও নিতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণবাবু সহানুভূতির স্বরে হেসে বললেন, জোয়ালটা ঠিক ধাতে সইছে না। তবে, একটা কথা কি জানেন, প্রথম জোয়াল কাঁধে উঠলে যতটা ঘাড় টনটন করে, কটা দিন গেলে আর সেটা থাকেনা। মানে, ঘাড়টায় কড়া পড়তে যে কটা দিন লাগে আর কি। তা এক কাজ করুন না, টায়ার্ড মনে হলে কদিন ছুটি নিয়ে নিন না। কাজ ছাড়বেন কেন?

ছুটি নেবার কথাটা অবশ্য তপনের একবারও মনে পড়ে না। অফিসের নিয়মে কদিন চাকরির পর ছুটি পাওয়া যেতে পারে তাও জানত না।

প্রস্তাবটা সাময়িক ভাবে মন্দ লাগলনা। জিজ্ঞেস করল, কিন্তু চাইলেই কি ছুটি পাওয়া যাবে?

শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, সাহেবের মর্জির ওপর নির্ভর করে সেটা। তা দেখুন না একখানা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করে। আমার নিজের শ্যালকটি ডাক্তার, ভীষণ ডেয়ারিং ডাক্তার। দু-চার টাকা বেশী দিলে টি-বি পর্যন্ত লিখে দিতে পারে।

তপন আঁতকে ওঠে, টি-বি?

শ্রীকৃষ্ণবাবু একটু হেসে বললেন, তবে আর কি বলছি? তা আপনার প্রথম ছুটিতো, একটু বড় অসুখ বিসুখ না দিলে অসুবিধে হবে। পুরানো হলে কি আর অত ভাবতে হয়, তখন ঐ আট আনা এক টাকার ডাইরিয়াতেই কাজ চলে যায়।

তপন একটু ভাবিত হল।—কিন্তু এক্সরে রিপোর্টটা চেয়ে বসে যদি।

শ্রীকৃষ্ণবাবু অভয় দেবার ভঙ্গীতে বললেন, খেপেছেন দাদা! এ হল আইনের রাজত্ব। কাগজ পত্র সব ঠিক থাকলেই হল। সাহেব

থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই অফিসে ঐ একই পদ্ধতি মেনে চলে কিনা, তাই কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

তপন একটু ভেবে বলল, মিথ্যে অসুখের ওপর যদি ডাক্তার সার্টিফিকেট্ না দিতে চায়?

বিজ্ঞের হাসি হাসলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, সত্যি ডাইরিয়া টাইফয়েড্ কটা পায় ছোকরা ডাক্তাররা। কেরানীরা আছে বলেই ঐ কাগজের ডাইরিয়া দিয়ে কোন রকমে শাকান্ন জুটছে ওদের। আমার তো প্রথম ছুটির সময় সার্টিফিকেট্ ছিল—ব্রেন ক্র্যাক্‌ট।

তপন হাসি চেপে অবাক হবার ভান করে বলল, তবে যে বললেন ডাক্তাররা সত্যি সার্টিফিকেট দেয় না।

শ্রীকৃষ্ণবাবু গর্বের হাসি হেসে বললেন, দেয়ই তো না। আমি কি সত্যিই পাগল ছিলাম নাকি তখন?

তপন লজ্জিত হবার ভান করে বলল, ও, তখনও ছিলেন না বুঝি?

তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বলে চললেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, না! আর ঠিক হয়ে গেল ছুটি। যাই হোক, দিন তো একখানা দরখাস্ত ঝেড়ে, দেখুন না কি হয়। সাহেব তো শুনেছি আপনাকে বেশ পেয়ার করে।

তপন একটু হেসে বলল, তা অবশ্য করেন। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, মুসলমানদের মুরগীর দরদের চেয়েও বেশী। আচ্ছা চলি তাহলে। ছুটি নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হত না।

তপন ঘুরতেই শ্রীকৃষ্ণবাবু ডাকলেন আবার। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে যে যাবেন, আপনার কেস্‌টা?

তপন অবাক হল, কোন কেস্?

—সেই যে মেয়ে-ঘটিত কেস্‌টা?

তপন হেসে বলল, ওটা প্রায় ম্যানেজ করে এনেছি। আচ্ছা বলব আপনাকে একদিন সব।

অনুযোগ জানালেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, আপনি তো দাদা আজকাল করে বিলকুল ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন।

যেতে যেতে হেঁয়ালী হেসে বলল তপন, শুধু কি আপনাদের, ফাঁকি আমি নিজেকেও দিচ্ছি,। আচ্ছা, এবার বলব একদিন।

চেয়ারে বসে ছুটির কথাটা আর একবার ভাবল তপন। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অন্তত কটা দিন তো ঠেকা দেওয়া যাবে। তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়। গেলেও অন্তত একমাসের মাইনেটা তো নিয়ে যাই।

ভগ্নদূতের মত বেয়ারা আবার খবর নিয়ে এল, সাহাব সেলাম দিয়া।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল তপন। এই সেলামের ঠ্যালাতেই মরলাম! মনে মনে শঙ্কিত হল, আদর করে আবার বি-এ-এর সাবজেক্ট-গুলো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা শুরু না করেন। তাহলে আব ছুটি নয়, আজকেই রেজিগনেসন্ দিতে হবে।

সাহেবের ঘবে ঢুকবার মুখে আচমকা মন্দিরার সঙ্গে মুখোমুখি। মন্দিরা ঐ ঘব থেকেই বেরুচ্ছিল। দুজনেই কিছুটা থতমত খেয়ে গেল। দুজনের চোখেই কিছুটা অস্বস্তি। সঙ্কোচ। শেষ পর্যন্ত তপনই প্রথম বলল।

—কালকের ব্যাপারটার জন্য খুবই দুঃখিত। অবশ্য আপনাকে সব খুলে বললে আপনি রাগ করতে পারবেন না জানি।

মন্দিরা আস্তে চোখ তুলে বলল, আমারও ঠিক একই বক্তব্য। আজ অফিসের পর একটু দেখা হলে ভাল হয়।

তপন সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে গেল। মন্দিরা খুশি হয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

কিন্তু অফিসের পর পর্যন্ত থাকা হলনা তপনের। তার আগেই একটা দৈব-দুর্ঘটনায় বাড়ী চলে যেতে হল ওর। তাও আবার পায়ে হেঁটে নয়, সাহেবের গাড়ী করে।

তপন ঘরে ঢুকতেই খুশিতে ডগমগ মিঃ. রাহা সংবাদ দিলেন, একটা সুখবর দিচ্ছি, স্বপনবাবু। ফ্রান্স থেকে আমার এক বন্ধু সদ্য

দেশে ফিরেছেন। তিনি ফোন করেছিলেন আজ আমার এখানে আসছেন বলে। আমি আপনার কথা বলেছি ওকে। অফিসে থাকবেন, এলে আলাপ করিয়ে দেব আপনার সঙ্গে।

তপনের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় সামান্য হেসে বলল, সেতো আমার সৌভাগ্য স্যার। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে উপকৃতও হওয়া যাবে।

ফিরে আসতে আসতে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপরত নিজের চেহারাটা কল্পনা করে মাথা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল বিহারী দ্বারোয়ানের হাতের গুলিছুটি। তারপর একে একে থানা, কোর্ট, জেল।

চেয়ারে এসে বসেও ঐ কথাই ভাবতে লাগল তপন। কিন্তু ভেবে কোন কূল-কিনারা পেলনা। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল, আচ্ছা, মাথা ঘুরে পড়ে গেলে কেমন হয়? জোর করে কড়া কড়া চিন্তা করে অনেকক্ষণ মাথাটাকে সুযোগ দিল ও ঘুরে উঠবার। কিন্তু ওর সমস্যায় মাথার কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলনা। অগত্যা মাথার দায়িত্বটা নিজের ঘাড়েই নিতে হল। তুতিনবার চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত একবার নিখুঁত ভাবে চেয়ার টেবিল নিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল তপন।

এরপর সিনেমার পর্দার মত দ্রুত এগিয়ে চলল ঘটনাগুলো। প্রথমে, কি হল, কি হল? তারপর হৈ চৈ, হুড়োহুড়ি, দৌড়ঝাঁপ. তারপর জলের ঝাপটা, ফাইলের হাওয়া।

চোখ বুজে পড়ে রইল তপন। কিছুক্ষণ বাদে টের পেল ডাক্তার এসেছে। নাড়ী দেখলেন ডাক্তার। সেই তু-টাকার কাগজের ডাইরিয়ার ডাক্তার কিনা কে জানে! কিছুক্ষণ নাড়ী টিপে, বুক দেখে (বুক টিপ টিপ করছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত তপন), বাণী দিলেন ডাক্তার, স্নায়বিক তুর্বলতা। একটা ওষুধ দিচ্ছি এখনই খাইয়ে দিন। কাজ না হলে একটা ইঞ্জেকসন্ দিতে হতে পারে। ভয়ের কিছু নেই।

এতক্ষণ বুঝছিল না তপন, স্বাভাবিক ফিট হওয়া লোক কখন চোখ

খোলে। ভয়ে ভয়ে ছিল, বেশী তাড়াতাড়ি না খোলা হয়ে যায়। জলের ঝাপটাতেও অনেক ভেবে চোখ খোলোন তাই। ফাইলের হাওয়াতেও নয়। কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে পাশ করা ডাক্তারের ওষুধেও চোখ না খোলাটা একটু বাড়াবাড়ি হবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু সর্বশেষে ইঞ্জেকসনের কথাটা কানে যেতেই সভয়ে সিদ্ধান্তে এল তপন, এবার জ্ঞান হওয়াটা বোধহয় ডাক্তার ও রুগী উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। তাই মিনিট দুয়েকের ভেতরই আস্তে আস্তে চোখ খুলল তপন। এবং চোখ খুলেই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার চেষ্টা করল ইঞ্জেকসনটা কত দূর।

সবার পিছে কেরানীদের ছোয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিঃ রাহা। স্বপন উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সন্ত্রস্ত ভাবে এগিয়ে এলেন, আহা হা, উঠবেন না, উঠবেন না। একটু বিশ্রাম করুন, তারপর গাড়ী করে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি আমি।

তপন সলজ্জ ভাবে উঠে বসে বলল, না না, আমি এমনিই যেতে পারব। কিছু হয়নি।

কিন্তু সাহেব শুনলেন না সে-কথা। বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে হল তপনের। তারপর শ্রীকৃষ্ণবাবুর হাত ধরে সন্তর্পণে নিচে নামতে হল। এবং সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে সাহেবের গাড়ীতেও উঠে বসতে হল।

যাবার সময় অবশ্য বারে বারে দুঃখ প্রকাশ করে গেল সাহেবের কাছে, সেই ফ্রান্স-ফেরতা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেল না বলে।

বাড়ী পর্যন্ত অবশ্য গেলনা তপন। বেশ দূরের একটা গলির মোড়ে গাড়ী থামিয়ে সেখানেই নেমে গেল। এবং গাড়ীটা দৃষ্টির বাইরে গেলে এই প্রথম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে মঁসিয়ে তপন! বিরাট ফাঁড়া কাটিয়েছে।

নয়

একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে এসেছিল জ্যোতি। অবশ্য মামাতো ভাই অশোকদার উৎসাহ দেখে প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। তবু ভাবল, বলা যায় না হয়তো কাজের চাপে সবসময় আমাদের খোঁজখবর করে উঠতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে কষ্ট অনুভব করেন আমাদের কথা ভেবে। একটা ফল্গু-স্নেহ বরাবরই আছে ভেতরে ভেতরে। না হলে গত কাল আচমকা, বোধহয় বছর তিনেক পরে, হঠাৎ ট্রামে দেখা হতে নিজেই যেচে জ্যোতি কি করছে জিজ্ঞেস করবেন কেন। আর কিছু করছেনা শুনেও লজ্জায় অধোবদন না হয়ে আজ অফিসে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করতে বলবেন কেন? অফিসার যখন। তখন নিশ্চয়ই ফালতু খাটাচ্ছেন না ওকে।

কিন্তু এসে দেখল, অশোকদা চাকরিটা হাতের মুঠে করে বসে থাকলেও জ্যোতিই হাত পেতে নিতে পারছে না সেটা। অফিসের কর্মচারীরা মাইনে বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করাতেই নতুন কিছু লোকের ডাক পড়েছিল। জ্যোতিও তাদের একজন। দাদার বদান্যতায় বিগলিত জ্যোতি কষ্ট করে তাই তেতালার সিঁড়ি ভাঙল না আর। নিচ থেকেই দাদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে অফিসের গেট থেকে বিদায় নিল।

ব্যাপারটা খুব বেশী দাগ কাটলনা ওর মনে। বোধহয় চাকরি প্রসঙ্গে চিরদিনই নিস্পৃহ বলে। চাকরি পেলে করে, না পেলেও হন্যে হয়ে ঘোরে না। পেলেও খুব বেশী দিন মনস্থির করে টিকে থাকতে পারে না।

মোটামুটি নিজের পেট চালানোর মত টিউশনি পায় এবং করে, সেটাই ওর সান্ত্বনা অথবা সেটাই জোর। সে জোরেই ও জীবনের নিরাসক্ত দর্শক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে এ-জি-বি-এর দিকে পা বাড়াল। দুতিন জন বন্ধু আছে ওখানে। অনেকদিন দেখা হয়না। কিছুটা আড্ডা মেরে আসা যাক।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ডাক শুনে থামল জ্যোতি। বিরাট একটা লাইন একেবেঁকে রাস্তার ওপরে এসে পড়েছে। ডাকটা ঐ লাইন থেকেই এল মনে হচ্ছে।

—আরে এই যে, এই যে, এদিকে।

সেদিকে তাকিয়ে দেখল দীপেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জ্যোতি এগিয়ে গেল ওর দিকে।

যাতায়াতের পথে এ জায়গাটা ও দেখেছে, কিন্তু কোনদিনই জায়গাটা সম্বন্ধে সচেতন ছিলনা। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীটার মত। পথে পড়ে আছে জানে, কিন্তু আস্থা নেই বলেই উৎসাহ নেই।

—দার্জিলিং থেকে ফিরলি কবে?

দীপেন হাসল, বেশ ছিলাম ভাই, কিন্তু একটা চাকরির প্রলোভন ফিরিয়ে আনল।

জ্যোতি একটা সিগারেট এগিয়ে দিল।—এখান থেকে নাম পাঠিয়েছিল বুঝি?

এ পাশে ও পাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল দীপেন, না ডেথ সার্টিফিকেট না হলে যেমন শ্মশানে ঢোকা যায়না, সেই রকমই এদের সার্টিফিকেট না পেলে আজকাল চাকরিতে ঢোকা মুস্কিল। তাই জ্যান্ত অবস্থায় ডাক্তার না ডাকলেও মরার পর ডাক্তার ডাকতে হয় সার্টিফিকেটটার জন্য। তাই সাধারণত বাইরে চাকরি যোগাড় করে এখানে এসে সবাই নাম লিখিয়ে অনুরোধ করে, আমার নামটা দাদা দয়া করে অমুক অফিসে পাঠান না একবার। আমার কেসটাও তাই।

ইতিমধ্যে লাইনে গুঞ্জন উঠেছে, দাদা ওখানে কি করছেন? লাইনে দাঁড়ান, লাইনে দাঁড়ান।

জ্যোতি একটু হেসে বলল, আমি দাদা বে-লাইনের লোক, একটু গল্প করতে এসেছি।

পেছন থেকে একজন টিপ্পনি কাটল, ও রকম গল্প করতে করতেই দাদা বেমালুম লাইনে মিলিয়ে যায়, ও সব জানা আছে।

দীপেন সঙ্কোচ বোধ করল। সামনের ও পেছনের লোককে ওর নির্দিষ্ট জায়গার সাক্ষী রেখে লাইন থেকে বেরিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল জ্যোতিকে নিয়ে।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটু হাসল জ্যোতি, বেকাঁর একজিবিসন।

দীপেন বাঁকা হেসে বলল, বিশেষ কোন গলির কথা মনে পড়ছে?

জ্যোতি ফিরে তাকাল।—এই সিস্টেমটা বড় খারাপ। রাস্তার লোককে যেন ডেকে ডেকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান, এই দেখ এখানে কত মজার মজার বেকার। চাকরির স্কোপ বাড়ালে আপসেই সবার চাকরি হবে, বেকার ধরে ধরে নাম লিষ্টি করতে হবেনা।

দীপেন বলল, অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখ, তবু তো এই অফিসের দৌলতে কিছু প্রাক্তন বেকার সাকারত্ব লাভ করেছে।

একটু হাসল জ্যোতি, তা অবশ্য ঠিক। মাঝে আমি মাস কয়েকের জন্য একটা চাকরি পেয়েছিলাম। বেকার গোনার চাকরি। পরিসংখ্যান তৈরীর জন্য। আমার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঁচিশ হাজার চার শ সাড়ে তিন।

—সাড়ে তিন!

—কেন না? লিষ্টের মাথাতেই নিজের নামটা লিখে হাফ্ লিখে রেখেছিলাম। বলেই নিয়েছে মাস কয়েকের চাকরি। ও চাকরির আগেও বেকার ছিলাম, পরেও বেকার থাকব সে তো ওরাও জানছে। অথচ ঠিক ও কাজটা করার সময় নিখুঁত বেকার নয়। তাই সব দিক ভেবেচিন্তে নিজেকে হাফ বেকার বলে লিষ্টিতে লিখে রেখেছিলাম।

হো হো করে হেসে উঠল দীপেন। তারপর জিজ্ঞেস করল, আর সব খবরটবর কি বল? স্বপন কেমন আছে?

—একই রকম। আজ এখানকার কাজ সেরে একবার আয় না। আমিও বিকেলের দিকে ওদের ওখানে যাচ্ছি।

লাইন সরতে শুরু করেছে দেখে দীপেন আর দাঁড়াতে সাহস পেলনা। বলল, ঠিক আছে, চেষ্টা করব। লাইনে যাই, পরে আবার ঢুকতে গেলে নতুন মনে করে হৈ হৈ শুরু করবে সব।

জ্যোতির কাছ থেকে সরে লাইনে এসে দাড়াল দীপেন।

দাদা নতুন কাজটা পাওয়ার পর থেকেই ওষুধ আর পথ্যের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করত স্বপন। বেশ বুঝত, চাকরিতে ঢুকেই নিশ্চয়ই এ্যাডভান্স পায়নি, ধার করেই এসব করছে। ক্ষীণ কণ্ঠে দু-একবার প্রতিবাদ করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু থেমে গেছে দাদার ধমক খেয়ে। মাও বুঝিয়েছে, নিশ্চয়ই পারছে বলেই করছে, কই, এতদিন তো চেষ্টা করেও এসব করতে পারেনি। কিন্তু আমি ভাবছি ওর নিজের শরীরটা ঠিক থাকলে হয়।

শেষের দিকে আবেগে আনন্দে ধরে এসেছিল মার গলা। আর ঠিক ঐ একই চিন্তায় অস্বস্তি বোধ করেছে, নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে স্বপনের। কিন্তু দাদা যে এই সামান্য চাকরির ওপর নির্ভর করে স্যানিটোরিয়ামে পর্যন্ত পাঠানোর কথা ভাবছে সেটা জানত না। জানল আজ বিকেলে ডাক্তারদা আসার পর তার মুখ থেকে। ডাক্তারদা বেরিয়ে গেলে রাগে ফেটে পড়ল স্বপন, অসম্ভব, এক পা নড়ব না আমি এখান থেকে।

মা উত্তর দেবার আগেই জ্যোতি উত্তর দিতে দিতে ঘরে ঢুকল, খবরদার সে চেষ্টাও করিস না। তপুদাকে জানিস তো, তাহলে স্রেফ্ চ্যাং দোলা করে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

স্বপন সোজা উঠে বসল বিছানার ওপর। তুইই আরো উস্কাচ্ছিস দাদাকে। দেখা হলেই তোদের কি নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস আমি বুঝিনা,·না ?

মনে মনে ভয় পেয়ে গেল জ্যোতি। কিছু টের পায়নি তো ? একটু হেসে বলল, আমি নিরীহ বেচারা আমাকে জড়াচ্ছিস কেন এর ভেতর ? কি বুঝিস বল তো।

—এই সব কিছু পরামর্শ দাদা তোর সঙ্গে করছে। ধারের ব্যবস্থা তুইই করে দিচ্ছিস।

দরজার কাছে ইতুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল জ্যোতি, এই ইতু, শুনে রাখ, আমার অবদানটা। এক কাপ চা চাইলেই তো তোর মুখ হাড়ী হয়ে ওঠে।

ইতু মুখ বাঁকাল, কবে চা চেয়ে পাওনি শুনি।

হাসল জ্যোতি, এখনই চাই কিনা তাই ভূমিকা করে রাখলাম।

কিছুটা ম্লান মুখে তপন বাড়ী ফিরল। মা বললেন, এই একটু আগে ডাক্তার এসেছিল।

তপন জুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, দেখা হয়েছে। মা উঠে কাছে এলেন, স্যানিটোরিয়ামের কথা কি যেন বলছিল, কি ব্যাপার ?

—বাংলা দেশের বাইরে একটা স্যানিটোরিয়ামে ওর এক বন্ধু ডাক্তার আছে। ওঁকে একটা ফ্রি বেডের কথা লেখা হয়েছিল ; সেখান থেকে চিঠি এসেছে, ঠিক বর্তমানে ফ্রি বেড না থাকলেও কিছুদিনের ভেতরই ব্যবস্থা করা যাবে। বর্তমানে দু-চার দিন পেয়িং-বেডে রাখতে পারলে ভাল হয়।

স্বপন আপত্তি জানাল, যদি ফ্রি বেড না পাওয়া যায়, তাহলে কতগুলো টাকার ধাক্কায় পড়তে হবে সেটা ভেবে দেখেছ ?

গামছাটা নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল তপন, ভাবনাটা এমনই জিনিস যা কেটে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিলেও ওজন কমেনা। ওটা আর ভাগ না করলি। গোটাটাই আমার থাক।

জ্যোতি অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। তপনের সঙ্গে সঙ্গে ও বাইরে গেল। কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, একটা অঘটন ঘটে গেছে তপুদা।

তপন গম্ভীর ভাবেই বলল, হ্যাঁ, ও ব্যাপারে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। কি শুনি ?

—সেই ফরাসী প্রবন্ধটার শেষ দুটো পাতা বাড়ীতেই পড়ে আছে দেখছি। সভায় তোমাদের সাহেবের তো বেইজ্জত হতে হবে।

নির্লিপ্তস্বরে বলল তপন, যাকগে, ও নিয়ে আর মাথা না ঘামালেও চলবে।

—কেন?

—বোধহয় ও দিককার খেল খতম।

—তার মানে?

চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল তপন, ছাদে চল, বলছি।

বিরাট উৎকণ্ঠা নিয়ে তপনের সঙ্গে ছাদে গেল জ্যোতি।—হঠাৎ কি হল আবার?

নিরস ভাবে বলল তপন, দূরদৃষ্টির অভাব।

—মানে?

একটু হাসল তপন, মানেটা একটু জটিল অবশ্য। অফিসে একজন অফিসার থাকবেনই সেটা জানতাম। কিন্তু, কর গুণেগুণে বলে চলে তপন—তিনি যে ফরাসী ভাষা না জেনেও ফরাসী সাহিত্যে পণ্ডিত হতে পারেন, তাঁর যে এক সদ্য ফরাসীদেশ ফেরত বন্ধু থাকতে পারেন এবং তিনি সশরীরে আমাদের অফিসে এসে হাজির হতে পারেন, ইকনমিকস্-এ কাঁচা তাঁর একটি আই-এ পড়া মেয়ে থাকতে পারে এবং স্নেহ করে সে মেয়ে পড়ানোর ভার আমার ওপরই দিতে পারেন, থামল তপন,—কটা হল?

জ্যোতি সোৎসাহে বলল, যে কটাই হোকনা, ঘাবড়ানোর কি আছে? স্রেফ্ ম্যানেজ করে যাও। ম্যানেজেরই তো রাজত্ব এটা। যেখানে পারছে ম্যানেজ করে যাচ্ছে, আর তুমি পারবেনা?

ক্লান্ত কণ্ঠে বলল তপন, নেহাৎ প্রাণের দায় বলে এমন ভাবে ম্যানেজ করে যাচ্ছি, যা তোরা হলে পারতিস না বোধহয়। সাহেবের সেই ফরাসী বন্ধু পর্যন্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে কোনক্রমে ম্যানেজ করেছিলাম। কিন্তু মোক্ষমটা তো আমার ক্ষমতার বাইরে।

হাসল জ্যোতি, মোক্ষমতো সব কটিই। কোনটি খুলে বল।

—সাহেবের মেয়ে পড়ানো। আগের পক্ষের মেয়ে। এদিকেই মামাবাড়ী থেকে পড়ে। নিজে আসতে পারছেন না বলে শ্বশুর মশায়ের কাছে পরিচয়পত্রটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতি ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

এবার চটে উঠল তপন, কেন বাবা? এই যে এতগুলো টাকা স্রেফ্ ফাঁকি দিয়ে মাইনে নিচ্ছিস, রেখে দে না একটি প্রফেসর। সেও দুটো খেয়ে বাঁচুক।

জ্যোতি কোন উত্তর দিলনা। চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল কি একটা প্ল্যান যেন মশার মত গুণগুণ করে মাথার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সচেতন ভাবে সেটাকে পাকড়ানোর চেষ্টা করছে ও।

তপন প্রায় নিজের মনেই বলল এবার, যাকগে, একদিক দিয়ে ভালই হল। এই মিথ্যে অভিনয় আর ভাল লাগছিলনা। সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আর একটা বিপদ কি জানিস। অভিনয় করতে করতে অনেক সময় নিজের সত্যি দামটাই ভুলে যেতাম। জীবনের ওপর লোভ বেড়ে যেত।

জ্যোতি এতক্ষণে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তপনের দিকে চোখ তুলে তাকাল।—আচ্ছা সাহেব কি শ্বশুর বাড়ীতে ঘন ঘন আসেন?

—কেন?

—শুনিই না।

তপন একটু ভেবে বলল, প্রায় যানই না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি বাঙ্গালী ললনা হলেও ঠিক অবলা নন। স্বামীর ভূতপূর্ব শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়াটা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। সম্ভবত তাঁর স্নেহাধিক্যের জন্যই মেয়েটির মামা-বাড়ী থাকতে হয়।

জ্যোতি খুশীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, কবে কবে যান তোমরা আগে থেকে ঠিক জানতে পার?

—সবসময় জানা যায়না অবশ্য। কারণ গোপন বিপ্লবীরা তাঁদের ঘাটিগুলো সম্বন্ধে যে সচেতনতা অবলম্বন করে থাকে, সাহেবের বোধ

হয় তার চেয়ে কিছু কম করতে হয় না বাগবাজার-মুখী হতে। তবে যতদূর শুনেছি একটু সচেতন থাকলে জানা খুব কষ্ট নয়। সাধারণত মেমসাহেব অফিসের পর নিজেই গাড়ী নিয়ে আসেন। না এলেও ড্রাইভারটি নাকি মেমসাহেবেরই গোয়েন্দা। কাজেই কালে ভদ্রে যেদিন গাড়ী মেমসাহেবের কাজে আটকা থাকে, সাহেবের ট্যাক্সীতে যেতে হয়, সে সব দিনই মাঝে মাঝে ও বাড়ী যান। কিন্তু এসব কথা জেনে তোর কি লাভ ?

একটু হাসল জ্যোতি, লাভ আমার না, তোমার।

অবাক হল তপন, কেন ?

—খেল্ খতম না, দোসরা খেল্ শুরু।

—মানে ?

জ্যোতি হালকা সুরে বলল, খুব সহজ। যস্মিন দেশে যদাচার। নদীর সহজ চলার পথে বাধা দিলে সে বাঁক নেবেই। প্রথমবার স্বপনের প্রক্সি দিয়েছ তুমি, এবার দেব আমি।

আকাশ থেকে পড়ে তপন।—কি করে ?

জ্যোতি সহজ ভাবেই বলল, যে করে তুমি ম্যানেজ করছ। কাগজের জোরে। স্বপন বা তোমাকে সেখানে কেউ কস্মিন কালে দেখেনি। মিঃ রাহার দেওয়া পরিচয় পত্রটাই সেখানে সবচেয়ে বড় স্বাক্ষী। দেখি, চিঠিটা দেখি।

হাত বাড়াল জ্যোতি। তপন হাতটা সরিয়ে দিল।—পাগল নাকি ? অতদিক সামলান যাবেনা। জাল গুটিয়ে তোলার বদলে শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই জড়িয়ে পড়তে হবে। ভালয় ভালয় যে প্রথম পর্বটুকু মিটেছে সেটাই কপাল। আর নতুন ধাপ্পায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবেনা।

বহুদিন পর জ্যোতি সিরিয়াস্ হল। ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু সমাজের মাথা হয়ে ওরা আমাদের যে ধাপ্পা দিচ্ছে তার চেয়ে বড় ধাপ্পা নিশ্চয়ই এটা নয়। এর সঙ্গে আমাদের ভাত কাপড়ের প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া আমরা পরিচয়ে ধাপ্পা দিলেও যে কাজটুকু দিচ্ছি তাতে তো ধাপ্পা নেই।

তপন বাধা দিল, কিন্তু আইন তা শুনবে কেন?

ক্ষুব্ধ স্বরে বলল জ্যোতি, বয়ে গেল্ল। যে আইন জীবনকে অস্বীকার করে তাকে অস্বীকার করার অধিকার আমার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

তপন একটু চিন্তা করে বলল, না, থাক। এ কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু এ আগুন নিয়ে খেলা।

হাসল জ্যোতি, খেলতেই যদি হয়, আগুন নিয়ে খেলতেই তো উত্তেজনা —তারপর একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বলল, তোমার জন্য বলছিনা তপুদা, স্বপনের কথা ভেবে বলছি। চিঠিপত্র লিখে স্যানিটোরিয়ামে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। স্বপন, পিসিমা, ইতু—সবার চোখে আবার আশার আলো দেখা দিয়েছে। লক্ষ্য করে দেখেছ, পিসিমা আজকাল ঠিক আগের মতই হাসে।

জ্যোতির উচ্ছ্বাসে বাধা দিল তপন, তা হোক, রিয়ালিটিকে রিয়ালিটি হিসেবে মেনে নেওয়াই উচিত। এভাবে—

জ্যোতি কথাটা লুফে নিল, এভাবে চিরদিন তোমাকে চালাতে বলা হচ্ছেনা। স্বপন ভাল হয়ে আসুক, সে কটা মাস কোন মতে ম্যানেজ করতে আপত্তি কি?

তপন আবার ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, না থাক। আমাদের জন্য এতবড় একটি রিস্ক—।

হো হো করে হেসে উঠল জ্যোতি। আবার নিজের স্বরূপে ফিরে এল। - তাই বল, এজন্যই তোমার আটকাচ্ছিল এতক্ষণ?

হঠাৎ মেজাজে আবৃত্তি করে উঠল জ্যোতি, 'আপদ আছে, জানি আঘাত আছে—তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।' চির জীবনটাই এ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলাম আর আজ তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ তপুদা!

একটু আমতা আমতা করল তপন, না সেজন্য নয়, মানে—।

হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল জ্যোতি। গভীর স্বরে বলল, দেখ তপুদা, সাতকুলে আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তবু একটু ঘরের

কোণের স্বাদ পাই তোমরা আছ বলে। জীবনে নেহাত খেয়াল বশেই এমন অনেক বেপরোয়া পথে পা বাড়িয়েছি যার তুলনায় এ কিছুই নয়। তবু তো এখানে একটা সান্ত্বনা থাকবে, নিজের খেয়ালের ভেতর দিয়েও অন্যের একটা উপকার করলাম।

তপন প্রায় নিজের মনেই বলল, কিন্তু বড় বেশী দূর এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে না?

জ্যোতি অভয় দিল, গোলমাল দেখলে পিছিয়ে এলেই হবে। দাও দেখি চিঠিটা একটু দেখি, শুভস্য শীঘ্রম।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দেয় তপন। চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করতে করতে চপল স্বরে বলল জ্যোতি, দেখ তপুদা, দুজনে মিলে যখন লিমিটেড্ কোম্পানীই খুলে ফেললাম তখন আর দূরে দূরে থেকে লাভ কি? মেস্ থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখানেই চলে আসি বরং।

তপন অবাক হল, পাগল নাকি? এখানে থাকবি কোথায়? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, না?

জ্যোতি যেতে যেতে বলে, এর ভেতরই ঠিক ম্যানেজ করে নেব, দেখ। দাঁড়াও, পিসিমাকে রাজী করিয়ে আসি।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় জ্যোতি।

দশ

পরদিন অফিসে এসেই খোঁজ করল মন্দিরা, স্বপনবাবু এসেছেন কিনা। আসেনি দেখে সামান্য চিন্তায় পড়ল। অথচ মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারলনা কাউকে কিছু। শেষপর্যন্ত সুযোগ পেল টিফিনের সময়।

রোজের মতই, সবাই বেরিয়ে যাবার পরও, সিনেমার কাগজে ডুবে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। মন্দিরা আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবাবুর হুঁস নেই। একটু হেসে চেয়ারে একটা শব্দ করে টানল মন্দিরা। আস্তে চোখ তুলে মন্দিরাকে দেখেই চমকে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু।

—আরে, আপনি! বসুন, বসুন।

মন্দিরা বলল, না না, বসবনা। একটা খবরের জন্য এসেছিলাম। স্বপনবাবুর ঠিকানাটা জানেন আপনি?

উৎসাহে জ্বলে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, হ্যাঁ, জানি।—কিন্তু বলেই হঠাৎ আবার মিইয়ে গেলেন।—অবশ্য বিশেষ অফিসিয়াল্ কাজ ছাড়া কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন উনি। তবে আপনার কথা আলাদা।

মন্দিরা বলল, আমারও অফিসিয়াল্ কাজেই দরকার্। ওঁর কাছে ভীষণ জরুরী একটা কাজ আটকে আছে। সে বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বিনয়ে গদগদ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হালদার তপনের বহুবার নিষেধ-করা ঠিকানাটা জানিয়ে দিলেন। তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, স্বপনবাবুকে দেখতে যাবেন তো? চলুন তাহলে আমিও যাই। আহা বড় ভাল লোক ছিলেন ভদ্রলোক।

মন্দিরা অবাক হল, ছিলেন মানে?

—না, মানে, ভাল লোক আর কি। আজ আসেননি তাই ছিলেন বলছিলাম। মন্দিরা আশ্বস্ত হল।—ও, তা আমার যে একটু অন্য জায়গা হয়ে যেতে হবে।

সোৎসাহে কথা লুফে নিলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু, আমিও না হয় হয়ে যাব।

বিরক্ত হল মন্দিরা, কোথায় হয়ে যাবেন?

এবার একটু থতমত খেলেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। মন্দিরার মায়া হল দেখে। স্বর নরম করে বলল, আপনার খুব আগ্রহ থাকলে না হয় চলুন আমাদের সঙ্গে। সাহেবও বোধহয় যাবেন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে তাহলে।

সাহেবের নাম শুনে চুপসে গেলেন ভদ্রলোক। ঢোক্ গিলে বললেন, তাহলে থাক, সময় পেলে আমি নিজেই যাবখন একবার।

মন্দিরা নিশ্চিন্ত হয়ে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল।

নার্ভাস উইকনেস যখন তখন অন্তত সপ্তাহখানেক চোখ বুজে অফিস থেকে ডুব দেবে ঠিক করেছিল তপন। খেয়ে দেয়ে মৌজ করে ঘুমের সাধনা করছিল তাই। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। শুয়ে শুয়েই হাঁক দিল তপন, কে?

কোন সাড়া নেই। কড়া নড়ে চলল।

বিরক্ত হয়ে মাথা তুলে জানালা দিয়ে উঁকি দিল তপন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত আতকে উঠল। বিদ্যুৎবেগে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এল। জামাটা গলিয়ে মাথাটা একবার আচড়ে নিল।

কড়াটা থেকে থেকে নড়ে চলেছে তখনও। মা চড়া সুরে ডাকলেন, দেখতো ইতু কে কড়া নাড়ছে।

মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতেই হেঁকে বলল তপন, যাইরে খ্যাপা, দাঁড়া একটু।

ইতু দরজা খুলবার জন্য এগোচ্ছিল, দাদার গলা কানে আসতে থেমে গেল। নিজের মনেই বলল, ও খ্যাপাদা। না হলে আর এমন জানোয়ারের মত কড়া নাড়বে কে!

তৈরী হয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত এসেই তপনের খেয়াল হল, ইতুর ছেড়া শাড়ীটা লুঙ্গি করে পরে আছে। ওখান থেকেই দ্বিতীয় হাঁক ছাড়ল, দাড়া খ্যাপা, এক মিনিট।

মা ইতুকে জিজ্ঞেস করলেন, তপু অমন দৌড় ঝাপ করছে কেন, ব্যাপারটা কি?

ইতু গল্পের বই পড়ছিল। ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে?

দৌড়ে এসে শাড়ীটা ছেড়ে পায়জামাটা পরে নিল তপন। তারপর দ্রুতপায় এসে, দরজা খুলল। ভীষণ সন্তর্পণে। কপাটটা খুলে বাইরে গিয়েই আবার ভেজিয়ে দিল কপাটটা। এবং একরাশ বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বলল, আরে, আপনি?

মন্দিরা স্মিত হাসল, রুগী দেখতে এলাম। কিন্তু রুগী যে—

ব্যস্ততার সঙ্গে বলল তপন, রুগীর ভীষণ একটা প্রয়োজনে একটু

বাইরে যেতে হচ্ছে। খুব দুঃখিত আপনাকে বসাতে পারলামনা, চলুন যেতে যেতে কথা হবে।

কোনরকমে গলিটা পার হওয়ার জন্য প্রায় হনহন করে মন্দিরাকে নিয়ে এগিয়ে গেল তপন। তারপর গলির বাঁক ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু টের পেলনা, মন্দিরার জন্য যার কাছে ওর সবচেয়ে বেশী গোপন অস্বস্তি, দূর থেকে, ওদের বাড়া আসতে আসতে সেই ওদের দেখে ফেলল। চোখে পড়তেই একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যাচাই করে নিল চিনু সত্যি তপুদাই কিনা। তারপর দেখে স্থির নিশ্চিত হল, হ্যাঁ, তপুদাই। কিন্তু মেয়েটি কে?

ঘরে ঢুকেই তাই প্রশ্ন করল ইতুকে, তোদের বাড়া কে এসেছিল রে, তপনদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল দেখলাম।

বই থেকে চোখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল ইতু, ক্ষ্যাপাদা।

খ্যাপাদা! অবাক হয় চিনু। স্পষ্ট দেখল একটি মেয়ে, আর চিনু দিব্বি ধাপ্পা মেরে দিল, খ্যাপাদা! মুখ ফুটে কিছু বলল না, কিন্তু প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল মনে। ইতু ওকে মিথ্যে বলল? কেন ও গোপন করল মেয়েটির কথা? মেয়েটি কে?

তপন কথা বলতে বলতে মন্দিরাকে নিয়ে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামে উঠে বসল। মন্দিরা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন আপনি?

একটু ভাবল তপন। তারপব ঘড়িটা দেখে বলল, দেরী হয়ে গেছে। যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গিয়ে আর লাভ নেই। চলুন আপতত এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্তই যাওয়া যাক। আপনার তো ওপথেই বাড়ী ফিবতে হবে।

প্রথম উত্তেজনাটা কেটে গেছে। মন্দিরার পাশাপাশি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কেমন যেন একটা মাদকতা অনুভব করল তপন। যতবারই মনে হল, ও অসুস্থ বলে ওকে দেখতে এসেছে মন্দিরা, ততবারই চিন্তাটার চার পাশে নানা রঙের একরাশ রামধনু এসে জমা

হতে লাগল। বিরূপ চিন্তায় অনেকবার চেষ্টা করল তপন রঙগুলোকে ফিকে করে দিতে। নির্বোধের মত আনন্দ বোধ করছি কেন? একি সত্যিই আমাকে দেখতে আসা? না, এম-এ পাশ অবিবাহিত ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল একটি যুবককে দেখতে আসা? সত্যিই তো, আমার নিজের এমন কি পরিচয় আছে, গুণ আছে, যাতে এ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে পারি। কিন্তু বৃথা। বারে বারেই ফিকে রঙগুলো গাঢ় হয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

এসপ্ল্যানেডে নেমে মন্দিরাই প্রস্তাব করল, আপনার কোন তাড়া আছে? না হলে চলুন চা খাওয়া যাক।

আপত্তি করলনা তপন। মন্দিরা ওকে নিয়ে কাফে-ডি মনিকোর নিরিবিলি একটা কোণে গিয়ে বসল। চৌরঙ্গীর হাটের ভেতর এরকম একটা নির্জন আলাপ-কোণ আছে জানত না তপন। এসব রেস্টুরেন্টে খুব বেশী যাতায়াত নেই ওর। কিন্তু মন্দিরার সহজ পদক্ষেপ দেখে বুঝল, মন্দিরা এসব তীর্থে নবাগতা নয়।

হুচারটা গতানুগতিক কথাবার্তার পর মন্দিরা বেশ সহজ ভাবেই সেদিনের সিনেমা হলের প্রসঙ্গটা আনল। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে যত ভয় পেয়েছিল তপন তার চেয়ে অনেক সহজে ফয়সালা হয়ে গেল। বোধহয় তুজনেই হাতে অনেকটা করে সময় পাওয়াতে প্রস্তুতিটা পাকা হয়ে ছিল। অনর্গল না বকে বাছাবাছা কয়েকটা মিথ্যে কথার তালিতেই বেশ জোড়া লেগে গেল আবার পূর্বের ছেড়া বিশ্বাসটা। অথবা তুজনেই তুজনের অজুহাত নিজেদের বিশ্বাস করিয়ে স্বস্তি অনুভব করল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তুকাপ চা নিয়ে বসল ওরা। প্রায় খালি ঘরে কোন তাগাদা ছিলনা ওঠার। ওদেরও কুণ্ঠা ছিলনা তাই। চায়ের কাপে তুফান ওঠার মত কোন প্রসঙ্গ অবশ্য ওদের আলোচনায় এল গেলনা। কিন্তু বাড়ী ফেরার সময়, মন্দিরার কথা বলতে পারেনা তপন, কিন্তু নিজের মনের কোণে ছোট্ট একটা তুফানের আভাস পেল যেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেল।

এগার

আসন্ন যুদ্ধের পরিপূর্ণ সাজ পোষাকে সজ্জিত জ্যোতি তপনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ইদানিং দিনগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। ভাল লাগছিল না। আবার কোথায়ও উধাও হবার পরিকল্পনা করছিল। কিন্তু এই নতুন অধ্যায়টা জ্যোতিকে চাঙ্গা করে তুলল আবার।

তপন কয়েকদিন ডুব দেবে ভেবেছিল। কিন্তু মন্দিরার ভয়ে আজ থেকেই অফিস-মুখ। হতে হয়েছে আবার। কে জানে, অতি উৎসাহে যদি রোজই রুগী দেখতে আসতে শুরু করে তাহলেই হয়েছে। সঙ্গে হঠাৎ কোনদিন শ্রীকৃষ্ণ হালদার এলে তো সোনায় সোহাগা।

তপন অফিস থেকে ফিরতেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করল জ্যোতি, সেই প্রবন্ধর কি হল ?

একটু হাসল তপন, সাহেব যথারীতি সভায় পাঠ করেছেন। সকলেই খুব তারিফ করেছে নাকি।

—সর্বনাশ ! শেষ দুটো পাতা থাকলে তো মেডেল-ফেডেল দিয়ে দিত দেখছি।—কৃত্রিম বিস্ময়ে বলল জ্যোতি। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল, ওদিকের সংবাদ শুভ ? যাত্রা করতে পারি ?

একটু চিন্তিত হল তপন। গভীর দৃষ্টি তুলে তাকাল জ্যোতির দিকে, যাবিই তাহলে ?

আঙ্গুল দিয়ে সামনের তাক দেখিয়ে গম্ভীর জবাব দিল জ্যোতি, দেরী করে লাভ কি ? পঞ্জিকাটা দেখে রেখেছি, আজ অত্যন্ত শুভ যোগ।

তাকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল তপন, ওটা গত বছরের পঞ্জিকা।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

রাস্তার নম্বর মিলিয়ে সঠিক বাড়ীটার কাছে এসে একটু থামল জ্যোতি। ঠিক ভয় নয়, কিছুটা উত্তেজনা অনুভব করছে। তবু নিজেকে শেষ বারের মত প্রস্তুত করে নিয়ে দমকে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু গেটের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হল।

সাবধান, ভেতরে কুকুর আছে।

ঝকমকে একটি বিজ্ঞাপন ঝুলছে গেটে। ভেতরে কুকুর আছে, কিন্তু গেটে দ্বারোয়ান নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারছেনা, ভয়ে ঢুকতেও পারছেনা। অথচ এসব বিরাট অভিজাত বাড়ীতে, বাড়ীতে কে আছেন, বলে হাঁক দেওয়াও ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তাছাড়া হাঁকটাও লনের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত বাড়ীর অন্দরে গিয়ে পৌঁছাবে কিনা কে জানে।

—কাকে চান ?

চমকে ফিরে তাকাল জ্যোতি। ছিমছাম একটি তরুণী।

—এটা মিঃ করের বাড়ী ? তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি ওর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, আসুন।

মেয়েটির পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল জ্যোতি। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে নিজের মনেই বিরক্তি প্রকাশ করল, দ্বারোয়ানটা যে কোথায় থাকে !

মেয়েটিকে অনুসরণ করতে করতে ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল জ্যোতি। বয়স বছর আঠার উনিশ হবে মনে হয়। যেভাবে হালফিলের বালতি-মার্কা ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে প্রায় নাচতে নাচতে যাচ্ছে তাতে এ বাড়ীরই কেউ হবে নিশ্চয়। অথবা এ বাড়ীর ঘনিষ্ঠ কেউ।

ছোট্ট লনটা পেরিয়ে বারান্দায় এসে উঠল ওরা। বারান্দার কোণে চেনে বাঁধা প্রায় বিড়ালাকৃতি একটি কুকুরকে নিচু হয়ে আদর করল মেয়েটি। নিরীহ কুকুরটা স্বভাবতই ঘর ঘর শব্দ করল। জ্যোতির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নিয়ে চাপা ধমক দিল ওকে মেয়েটি,

টাইগার, ডোণ্টবি নটি।—তারপর জ্যোতির দিকে তাকিয়ে অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই, আসুন।

রাস্তার ওপর কুকুরের বিজ্ঞাপনের আসল কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। এ কুকুর তর্জনে গর্জনে কোনদিনই রাস্তার লোকের কাছে নিজের অস্তিত্ব ও প্রভুর আভিজাত্য ঘোষণা করতে পারবেনা। বাধ্য হয়েই তাই বিজ্ঞাপন লটকাতে হয়েছে।

মেয়েটি ওকে নিয়ে বারান্দার কোণের দিকে একটা ঘরে ঢুকল। বেশ সাজান-গোছান একটা বসবার ঘর। ওকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল মেয়েটি। দুরু দুরু বুকে আসল ব্যক্তিকে মোকাবিলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল জ্যোতি।

একটু বাদেই তিনি এলেন। প্রায় বৃদ্ধ। থলথলে চেহারা। দেখে খুব রাশভারী মনে হয় না। বরং কিছুটা ঢিলেঢালাই মনে হয়। মনে মনে আশ্বস্ত হল জ্যোতি। নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ রাহার চিঠিটা বের করে দিল।

চিঠিটা পড়ে ওকে বসতে বললেন মিঃ কর। নিজেও বসতে বসতে বললেন, ও আপনিই স্বপন বাবু। হ্যাঁ, আপনার কথা সব শুনেছি রামকমলের কাছে। আপনার পরিশ্রমের কথা ভেবে আমি অবশ্য প্রথমে একটু আপত্তিই করেছিলাম—।

জ্যোতি বিনয়ের সঙ্গে বাধা দিল, না না, এতে আর পরিশ্রমের কি আছে। আজে বাজে সময় নষ্ট না করে বরং একটু পড়াশুনার চর্চার ভেতর থাকতে পারলে নিজেরও উপকার।

মিঃ কর সায় দিলেন, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আজকাল এ ধরনের কথা ঠিক শোনা যায় না কিনা। আচ্ছা চলুন, আপনার ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

মিঃ কর জ্যোতিকে দোতলায় নাতনীর পড়ার ঘরে নিয়ে এসে বসালেন। তারপর চাকরকে দিয়ে ডেকে আনালেন নাতনীকে। জ্যোতি সবিস্ময়ে দেখল, ওকে পথ-দেখান মেয়েটি। মেয়েটিও একটু অবাক ও বিব্রত হল।

ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ কর। আমার একটু কাজ আছে, চলি। সঙ্কোচ করবেন না। যখন যা প্রয়োজন হয় বলবেন।

জ্যোতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, না না, সঙ্কোচের কি আছে। বলব।

মিঃ কর বেরিয়ে গেলে ছাত্রী সুজাতার দিকে ফিরে তাকাল জ্যোতি। সুজাতা এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখছিল জ্যোতিকে। চোখাচোখি হতে একটু হেসে বলল, বসুন।

বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল জ্যোতি, আপনি কোন কলেজে পড়েন?

—স্কটিসে।—তারপর একটু থেমে বলল, আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন, তুমিই বলবেন।

—কম্‌বিনেসন্ কি?

প্রাথমিক জড়তাটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠছে সুজাতা। স্বভাব সুলভ চটুল স্বরে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, এই সেরেছে, প্রথম দিন থেকেই পড়াতে শুরু করলেন?

বিব্রত হল জ্যোতি। বলল, না না, পড়াচ্ছিনা। একটু জেনে-টেনে নিচ্ছি। ইকনমিক্‌স-এ তুমি বুঝি একটু কাঁচা?

সুজাতা হাসল, একটা সত্যি কথা বলব? কিছুতেই পাকা নই, কিলিয়ে পাকাবার চেষ্টা করছে সবাই। পড়াশুনা করতে বিচ্ছিরি লাগে আমার।

—তাহলে কলেজে পড়ছ কেন?

সুজাতা অকুণ্ঠ স্বরে জবাব দিল, কলেজ খারাপ লাগেনা।

এর উত্তরে ছোট্ট একটা 'ও' বলা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পেলনা জ্যোতি।

—আপনি খুব ভাল ফরাসী ভাষা জানেন, না?

একটু অবাক হল জ্যোতি।—তুমি কি করে জানলে?

—বারে; বাবার কাছে। বাবা আপনার কথা খুব বলেন। খুব প্রশংসা করেন।

হাসল জ্যোতি।—আমাকে স্নেহ করেন বলে বোধহয়।

হঠাৎ মনে পড়ায় সামান্য উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করল সুজাতা, আপনার সেই অসুখটা কেমন আছে ?

হকচকিয়ে গেল জ্যোতি।—অসুখ! কিসের ?

সুজাতা একটু গর্বের সঙ্গে বলল, আপনার ফিটের অসুখ আছে আমি জানি।

আকাশ থেকে পড়ে জ্যোতি। ফিটের ব্যামো! বছর দশেক আগে একটা বাস এক্সিডেণ্টে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো সেরকম কিছু স্মরণ করতে পারছে না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ও এখন স্বপন ও তপনের একটি নতুন যৌগিক সত্তা। সুতরাং শুধু নিজের কথা স্মরণ করে লাভ নেই।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু হাসল সুজাতা, আপনি গোপন করলে কি হবে, আমি জানি সেদিন আপনি অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

জ্যোতি একেবারে আন্দাজে, একটু লাজুক লাজুক হেসে বলল, ও, সেদিনের কথা বলছ ? সে ঐ হঠাৎই, এখন ভালই আছি।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তোমার দাদু কি করেন ?

সুজাতা গর্বের সঙ্গে বলল, বিজ্‌নেস। দাদুদের প্রায় দশ পুরুষের ব্যবসা। ব্যবসা ব্যবসা করে একেবারে পাগল এঁরা। দাদুকে অবশ্য এই প্রথম বুড়ো বয়সে দেখছি অন্য দিকে কিছুটা মেতেছেন।

—নতুন ব্যবসায় ?

একটু হাসল সুজাতা, না, রাজনীতি। খুব মেতে উঠেছেন পলিটিক্স নিয়ে।

জ্যোতি কপট উৎসাহ দিল, এ তো খুব ভাল কথা। দেশের জন্য কিছু করা—

সুজাতা বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, স্যাক্রিফাইস্‌ও অবশ্য করছেন।

দাদুদের প্রায় তিন পুরুষ ক্রমান্বয়ে বৃটিশ গভনমেণ্টের কাছ থেকে রায় সাহেব খেতাব পেয়ে আসছেন। দাদু স্বেচ্ছায় সেটা ত্যাগ করেছেন এখন। বাড়ীর সামনে নেম্ প্লেট থেকে পর্যন্ত রায় সাহেবটা তুলে দিয়েছেন।

অবাক হবার ভান করে জ্যোতি, তাই নাকি! ইলেকসনে দাড়াচ্ছেন না কেন?

সুজাতা জ্যোতির কথার কোন জবাব দেবার সময় পেলনা। বারান্দার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ছোট মামা, এই ছোট মামা।

আবার নিজেকে প্রস্তুত করে ফিরে তাকাল জ্যোতি। ফুলপ্যাণ্ট ও ছাপ ছাপ বুশ্ সার্টপরা একটি ছিমছাম যুবক এসে ঘরে ঢুকল। মাথার সামনের দিকের চুলের স্ফীত ঢেউয়ের ভেতর থেকে এক গোছা চুল গড়িয়ে এসে কপালের ওপর পড়েছে। ইচ্ছাকৃত কিনা বোঝা গেলনা। স্মার্টনেস এতে কিছুটা বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছুটা বাউণ্ডুলে কাপ্তেন ভাবও এসেছে চেহারায়। সেটাই ওর কাম্য কিনা বুঝতে পারল না।

ছোটমামা বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে জ্যোতিকে দেখতে দেখতে কাছে এল। নমস্কার করে বাঁকা হেসে বলল, আন্দাজেই চিনেছি, আপনি স্বপনবাবু তো? জামাইবাবুর কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো নতুন জয়েন্ করেছেন ওখানে?

হাসিতে এবং বলার ভঙ্গীতে আপাদ ভদ্রতার ভেতরও একটা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতার আভাস টের পেল জ্যোতি। সুজাতা পরিচয় করিয়ে দিল, আমার ছোট মামা, তুষার কর।

নমস্কার করল জ্যোতি।

—আমি আগে মাঝে মাঝে দু'এক সময় যেতাম আপনাদের অফিসে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল জ্যোতি, এখন যান না?

আলগাভাবে জবাব দিল তুষার, না, একটা আনপ্লেজেণ্ট ঘটনা

ঘটে যাবার পর থেকে আর যাই না। তা আপনাদের সেই শ্রীকৃষ্ণটি কেমন আছেন ?

প্রস্তুত ছিল জ্যোতি। হেসে বলল, এই একরকম আর কি।

একটু সুর পাল্টে জিজ্ঞেস করল তুষার, মিস্ মিত্রের সঙ্গেও তো আপনার বেশ ভালই আলাপ আছে বোধহয়।

জ্যোতি বিপদে পড়ল। এই নামটি প্রসঙ্গে তপুদার কাছ থেকে কোনদিন কিছু শুনেছে বলে মনে করতে পারলনা। তবু সামলে নিয়ে বলল, অফিসের প্রয়োজনে যেটুকু থাকা উচিত।

বলেই বুঝল জ্যোতি জবাবটা একটু কৈফিয়ৎ ধরনের হয়ে গেল প্রথম থেকেই, বোধহয় জামাইবাবুর কর্মচারী বলে, বেশ ভারিক্কী চালে কথাবার্তা শুরু করেছে তুষার। জ্যোতি সিদ্ধান্তে এল, খুব বেশী বিনয়ী হওয়াটা উচিত হবেনা। শেষ পর্যন্ত পেয়ে বসবে তাতে।

কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল তুষার, দুটো সিনেমার টিকিট কেটেছিলাম, তা তোর তো সু যাওয়া সম্ভব হবেনা বোধহয়।

সুজাতা লাফিয়ে উঠল।—কেন হবেনা ? মাস্টার মশায়—

—আচ্ছা ঠিক আছে, আজ আমারও একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। –জ্যোতি আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল।

তুষার বাঁকা হাসল, যেদিন যেদিন আসবেন ফোন করে আসবেন মাস্টার মশায়। ছাত্রীর পড়াশুনায় কেমন মনোযোগ দেখছেন তো--

হাসল জ্যোতি, কচি মন তো, বিয়োগের উপকরণগুলো সামনে তুলে ধরলে যোগে সময় সময় ভুল করে ফেলে বোধহয়।

লক্ষ্য করল জ্যোতি, প্রথম আক্রমণেই আপাদমস্তক স্মার্ট তুষার কর কিছুটা বিচলিত হল। কথাটার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছে বুঝল। সেই ফাঁকেই নমস্কার করে বিদায় নিল জ্যোতি, আচ্ছা, চলি।

তুষার ভুরু কুঁচকে বলল, এ[illegible] হচ্ছে, না ?

সচ্ছন্দে মাথা নাড়ল সুজাতা, নাঃ

—উঁ।—সুজাতার দিকে ফিরে তাকাল তুষার। তারপর ইংগিত-পূর্ণভাবে হেসে বলল, হুঁ!

সুজাতা কপট রাগে ওকে একটা চিমটি কাটল, যাঃ, অসভ্য কোথাকার।

বার

চিনু এতদিনে সত্যিই ভয় পেল। এতদিন ভরসা ছিল জ্যাঠামনি। মোটামুটি একটা অঘোষিত যুক্ত ফ্রন্ট তৈরী করে ওরা লড়ে যাচ্ছিল জেঠিমার সঙ্গে। কেন কে জানে, জ্যাঠামনি কোন পাত্রকেই ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিলেন না। অবশ্য পছন্দ হবার মত পাত্রও ঠিক আসছিলনা। নিখুঁত পাত্র যেচে আসার মত পাত্রীও নয় ও, জানে চিনু।

কিন্তু এবার, জেঠীমার দূর সম্পর্কের এক খুড়ীমা এসে হাজির হবার পর, জ্যাঠামনিও কিছুটা বেকায়দায় পড়েছেন। গঙ্গাস্নানের জন্য বুড়ী মেয়ের বাড়ী এসেছিলেন কলকাতায়। সেখান থেকে এ বাড়ী এসেছেন কয়েকদিন থেকে যাবার জন্য। বুড়ী সঙ্গে শুধু গঙ্গাজল নেবার কটি পাত্রই আনেনি, একটি জলজ্যান্ত উপযুক্ত পাত্রেরও সন্ধানও এনেছেন। নিজের ছোট ছেলের। এবং পাত্রী হিসেবে কেন যেন প্রথম দৃষ্টিতেই চিনুকে পছন্দ হয়ে গিয়েছে।

বেশ বুঝল চিনু, এবারের আক্রমণটা শুধু জ্যাঠামনির উপর ভরসা করে বসে থাকলেই আটকান যাবেনা। নিজেরও সচেষ্ট হতে হবে।

কিন্তু ভাবলেই কি সচেষ্ট হওয়া যায়? কি বলবে ও জ্যাঠামনিকে। বিয়ে করবেনা? কিসের জোরে বলবে? এ সংসারে ও শুধু ভার। চাকুরে মেয়ে হলে বলতে পারত, আমার জন্য কারো ভাবতে হবেনা। কিন্তু ওর নিজের ভবিষ্যৎ যে ওর নিজেরও দুর্ভাবনা। একমাত্র বিকল্প ছিল, যদি নিজে কেউ এগিয়ে এসে বলত, ওর ভার আমি নিচ্ছি

আপনারা ভাববেন না। কিন্তু চিনুর মত সাধারণ মেয়ের জন্য এ উদাত্ত ঘোষণা দেবার মত উদার কণ্ঠ স্বপ্নই।

এতদিন কি তাহলে ও স্বপ্ন দেখেছে। যার চোখের দর্পণে এতদিন নিজের মুখ দেখবার চেষ্টা করছিল, সেকি মিথ্যে। করুণ কল্পনা। নাকি অজস্র কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী বলেই সে দর্পণ পাষাণ।

ইতুর মাধ্যমে যথাসময়ে সংবাদটি পৌঁছেছিল তপনের কাছেও। কিন্তু দাদার চোখের দর্পণে এ সংবাদের কোন সঠিক প্রতিচ্ছায়া চোখে পড়লনা ইতুর। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে তপনও একটু অবাক হল। এর আগে চিনুকে যতবার পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে প্রতিবারই একটা কারণ খুঁজে-না-পাওয়া অস্বস্তি অনুভব করেছে তপন। পাত্রপক্ষ ফিরে গেলে অকারণ স্বস্তি বোধ করেছে। মনে মনে ভেবেছে, চিনুর এর চেয়ে ভাল পাত্রর হাতে পড়া উচিত। কেন উচিত, কোনদিন ভাবতে বসেনি। উচিত পর্যন্তই ভেবেছে।

মনের সামনে তখনই অবশ্য একটা কারণ দাঁড় করিয়ে নিজের কাছে দায় এড়াল তপন। এসব ভাববার এখন সময় কই। স্বপনকে স্যানিটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থায় ব্যস্ত এখন।
এর সঙ্গে অফিসের আতঙ্ক তো আছেই। তার ওপর এখন বাড়তি উৎকণ্ঠা জ্যোতির ট্র্যাশনি।

অফিসের আতঙ্কের ওপর এখন নতুন করে যোগ হয়েছে এক অস্বস্তি। সেদিন নাটকের যবানকা পতন মনে করে, অভিনয়-পোষাক ত্যাগ করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তপন। কিন্তু জ্যোতির সহায়তায় নাটকের যবনিকা পতন না হয়ে দৃশ্যান্তর ঘটল মাত্র। নতুন করে আবার অভিনয় পোষাক পরা অবান্তর তখন। কারণ দর্শকরা সকলেই ওর আসল মুখের পরিচয় পেয়ে গেছে ততক্ষণে। অগত্যা নতুন পরিচয়টাই বজিয়ে রাখতে হল তপনের। কিন্তু উচ্ছ্বাসটুকু বাদে। সবার সঙ্গেই মিশতে হয় বলেই সাবধানে মিশতে হয়। অসাবধানতা আত্মঘাতী হয়ে না ওঠে সেই ভয়ে।

ইতু শুধু আভাসই দিয়েছিল, কিন্তু রাত্রে মা এলেন সরাসরি প্রস্তাবটা নিয়ে।

—দুপুরে বিজয়বাবু এসেছিলেন।

তপন বই পড়তে পড়তেই জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ ?

—চিন্নুর খোঁজেই এসেছিলেন, তবে যাওয়ার সময় একটা কাজের কথাও বলে গেলেন।

নির্লিপ্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল তপন, কি কথা ?

– শুনলে তো তুই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবি। সরাসরি প্রস্তাব করেননি, তবু আভাসে ইংগিতে চিন্নুর জন্য একটা প্রস্তাব করে গেলেন।

ঠাট্টার সুরে বলল তপন, অগ্নিশর্মা হব কেন ? এ তো শুভ প্রস্তাব।

—কেন, অশুভই বা কিসে শুনি ? চিন্নু কি ফেলনা মেয়ে নাকি ?

মা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বুঝল তপন। বই নামিয়ে বলল, দেখ মা, আপত্তি মেয়েতে নয়, বিয়েতেই। এত সব চিন্তা-ভাবনার ভেতরও বিয়ের কথা তোমরা ভাব কি করে বল তো।

মা বলল, তোকে কি আর এখনই বিয়ে করতে বলা হচ্ছে নাকি? স্বপন ভাল হয়ে এসে একটা চাকরি বাকরি পাক, ইতুর একটা ব্যবস্থা হোক, তারপরের কথাই ভাবছি।

তপন হাসল, সে অনেক পরের কথা। এত আগে ভেবে মাথার চুল পাকাচ্ছ কেন ?

—সে কথা তো বুঝিয়ে দিতে হবে না। সবাই বোঝে। বিজয়বাবুও বলছিলেন, এখন আপনাদের নানান ঝঞ্ঝাট বুঝছি। তবু এ প্রসঙ্গে আপনাদের মতামতটা শুধু জানতে চাচ্ছিলাম।

ইতু এসে ঘরে ঢোকায় তখনকার মত প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু তখনকার মত চাপা পড়লেও রাত্রে চিন্নুর চিন্তাটা আবার ভাবিয়ে তুলল তপনকে। বেশ কিছুদিন হয় নতুন করে চিন্নুর মূল্যায়ন

প্রচেষ্টা চলছিল তপনের মনে। কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারেনি।

অবশ্য চিনুর সঙ্গে প্রেম বলতে যা বোঝায় সে সম্পর্ক ওর কোনদিনই নয়। কোনদিন মুখ ফুটে কেউ কারো কাছে এ প্রসঙ্গ তোলেনি। কিন্তু প্রেমের ঘোষণা না থাকলেও পারস্পরিক একটা অঘোষিত বোঝাপড়া যে ছিল সেটা কি অস্বীকার করা যায়। জবাবদিহিটা তাই চিনুকে নয়, নিজের মনকেই দিতে হচ্ছিল তপনের।

হয়তো এ প্রশ্ন আজ আসত না, যদি না ওর স্বপনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ চাকরিটা নিতে হত। মন্দিরার সঙ্গে পরিচয় হত। ওর গোটানো মনটাকে যদি না মন্দিরা নাড়া দিয়ে আলোয় এনে দাঁড় করাত।

মাঝে একদিন মন্দিরার বিশেষ অনুরোধে ওদের বাড়ী গিয়েছিল তপন। ছিমছাম সাজান-গোছান ঘর আর ওর মা-বোনের মার্জিত রুচি-সম্পন্ন আলাপ-পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছিল তপন। রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

এ স্বাদ তপনের জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। নিজের শিক্ষাগত দৈন্যের জন্যই সামাজিক উৎসব, আসর বা আত্মীয়স্বজনের নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখত ও নিজেকে। সবখানেই অনুভব করত যেন ওর প্রতি আর সবার নীরব একটা অনুকম্পা। সবার চোখে লক্ষ্য করত ম্লান অবহেলা ছায়া। তাদের যান্ত্রিক সৌজন্য ও শুকনো আপ্যায়নে নিজেকে আরো বেশী ছোট মনে হত। স্বপন অবশ্য অনেক সময় অনুযোগ করত দাদার এ আত্মগোপনের মনোভাবকে। বলত, এ তোমায় মিথ্যে সন্দেহ, নেহাতই আত্মনিগ্রহ। কিন্তু সে অনুযোগ তপনকে বিন্দুমাত্র সামাজিক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেনি কোনদিন।

কিন্তু মন্দিরার নৈকট্য এত হিসেবি তপনকেও কেমন যেন বেহিসেবী করে তুলছে মাঝে মাঝে। নতুন করে আবার নিজের মূল্যায়নের চেষ্টায় উৎসাহিত করছে।

সেদিন পার্কের কথাটা মনে পড়ছে। মন্দিরা কি একটা জরুরী কথার জন্য যেন ওকে অপেক্ষা করতে বলেছিল পার্কে।

মন্দিরা কিছুটা দেরীতে এসেছিল। এসে ক্ষমা চেয়েছিল।

—কি ব্যাপার, এত, জরুরী তালব কেন?—জানতে চেয়েছিল তপন।

—কাল আমার জন্মদিন। আপনাকে নিয়ে একটু মার্কেটিং এ বেরুব ভাবছি।

মনে মনে খুশির বদলে বিরক্ত হয়েছিল তপন। এতটা ঘনিষ্ঠতা ওর ভাল লাগছে না। আর, এসব হালকা খুশির ব্যাপারগুলো নিজের কাছেও নিজেকে আজকাল অপরাধী করে তোলে অনেক সময়।

মন্দিরা একই বেঞ্চে একটু দূরত্ব রক্ষা করে বসে ছেলেমানুষী স্বরে বলল, জানেন, পার্কে ঢুকতেই এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম না!

—কেন?

—অন্যমনস্কে আসছি হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে হুম করে সামনে লাফিয়ে পড়ল একটা কিম্ভুতকিমাকার জন্তু।

তপন অবাক হল, সেকি?

মন্দিরা হাসল, অবশ্য ভুলটা তখনই ভাঙ্গল। একটা মুখোসওয়ালা ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল।

তপন আশ্বস্ত হল। এবং কিছুটা গম্ভীর। সামান্য অন্যমনস্কও।

মন্দিরা লক্ষ্য করল। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন?

তপন ফিরে তাকাল, ভাবছি, আমরা বোধহয় কোনসময়ই মানুষের সত্যি মুখের দাম দিতে পারিনা। মুখোস দেখেই ভয় পাই, মুখোস দেখেই ভালবাসি।

মন্দিরা হাসল, সুর কেটে গেল হঠাৎ।

তপন ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে সামান্য হেসে বলল, ভুল তারে বাঁধা হয়েছিল বোধহয়।

মন্দিরা বাধা দিল, বসুন। সত্যি কি হয়েছে বলুন তো। আপনি হঠাৎ মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কি যেন ভাবেন। কি ভাবেন?

তপন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। অনেকদিন থেকে উসখুস করা প্রশ্নটা যাচাই করে দেখার এ সুযোগটা ছাড়ল না আজ। একটু ভেবে বলল, এ প্রসঙ্গের সঙ্গে কোন যোগ নেই, তবু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না?

মন্দিরা সচেতন হল।—মনে করার কি আছে?

একটু ইতস্তত করে বলে তপন, আচ্ছা বলুন তো, মেয়েরা ভালবাসে কাকে?

একটু অবাক হয় মন্দিরা।—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝলেন না? মানে, এই ধরুন, কি কি গুণ দেখে ভালবাসে।

মন্দিরা একটু ভাবল। তারপর গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, ঠিক এক কথায় বলা মুস্কিল, তবে সাধারণত মেয়েরা দেখে বিদ্যা, বুদ্ধি, বৃত্তি—

তপন হাত তুলে বাধা দিল, ব্যাস, ব্যাস, ওতেই হবে। আসুন একটা একটা করে ধরা যাক। ধরুন বিদ্যা। কিন্তু বিদ্যার মাপকাঠিটা কি? শুধু পাশ-ফেল? তাও যদি মেনে নিই, তবে কোন পাশ? ধরুন কোন আই-এ পাশ ছেলেকে ভালবাসল একটি মেয়ে। তারপর আলাপ হল কোন বি-এ পাশ ছেলের সঙ্গে। তাহলে কি আগের প্রেমটি নাকচ হয়ে যাবে?

মন্দিরা আপত্তি জানাল, তা কেন? মানুষ মানুষকেই ভালবাসে, তার পাশ-ফেলটাকে ন·।

তপন শান্ত স্বরে বলল, জানেন, আমার একটি বন্ধু আছে নন্‌ম্যাট্রিক। কিন্তু তার সাথে আলাপ করে আপনি বুঝতেই পারবেন না। ওর সঙ্গে একটি মেয়ের একবার—

মন্দিরা হঠাৎ বলে বসল, দেখুন, প্রথমেই ভালবেসে ফেললে অন্য কথা, কিন্তু নন্‌ম্যাট্রিক শুনে প্রেমে পড়া মুস্কিল। অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ না করলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয় না যেন। অবশ্য, এটা হয়তো আমাদের সংস্কারই—।

একটা চাবুক খেল যেন তপন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে ধাতস্থ করে নিল। তারপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল,

হ্যাঁ, নির্মম সংস্কার। ধরুন না, আমাদের কথাই ধরুন। আমি কলেজের বিদ্যের কোন পরিচয় দিইনি আপনাকে। অথচ যতদূর মনে হয় আমার সঙ্গ আপনার কাছে বিরক্তিকর মনে হয় না। তাহলে বিদ্যের জন্য ভাললাগাটা নাকচ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

কপট বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টে বলে মন্দিরা, বাবারে বাবা, আপনার নিশ্চয়ই লজিক ছিল আই-এ-তে।

শুকনো হাসল তপন, হ্যাঁ। কেন, আলোচনা করবেন?

—আলোচনা?—ভয়ে কাঠ হল যেন মন্দিরা।—বাপস্, ঐ নামটাই শুধু মনে আছে, আর এক অক্ষরও মনে নেই। রক্ষে করুন।

তপন একটু হাসল, আচ্ছা বলুন তো, শিখে যারা ভুলে গেছে আর যারা আদৌ শেখেনি, তাদের ভেতর তফাৎটা কি?

মন্দিরা ভুরু কোঁচকাল, ব্যাপারটা কি বলুন তো? বিদ্যের ওপর এত রাগ কেন আপনার। ঘরের শত্রু বিভীষণ দেখছি।

এতক্ষণে খেয়াল হল তপনের, ক্রমশই আলোচনার ধারাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে। মন্দিরার যে এতক্ষণ কোন সন্দেহ হয়নি সেটাই আশ্চর্য।

একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, প্রায় তাই। এই পাশ-ফেলের নিক্তিতে মানুষ মাপার পদ্ধতিটা বড় নির্মম মনে হয়। হয়তো আমার সেই বন্ধুকে আমি ভীষণ ভালবাসি বলেই সমস্যাটা মাঝে মাঝে আমাকে এত নাড়া দেয়।

মন্দিরা আগের উক্তির জন্য লজ্জিত হল। বলল, দেখুন, আমি তখন কথাটা ভেবেচিন্তে বলিনি। মেয়েরা আসলে যাকে ভালবাসে তাকে মানুষ হিসেবেই ভালবাসে। আর সব গৌণ।

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তপন মন্দিরার চোখের দিকে। কোনটা সত্যি!

সত্যি জবাবটা অবশ্য আজো ঠিক পায়নি তপন। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যি হতেই বা আপত্তি কি? শুধু একটা কাগজের

সেনসার্‌ড এ্যাণ্ড পাস্‌ড সার্টিফিকেট্‌ ছাড়া আর কি নেই ওর। কিন্তু যত জোর দিয়ে কথাটা ভাববার চেষ্টা করে ঠিক ততটা জোর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেনা তপন। সন্দেহ হয়, মন্দিরা কি সত্যিই ওর তপনত্বকেই শ্রদ্ধা করছে, ভালবাসছে, নাকি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে স্বপনের মুখোসটার দৌলতে।

ঠিক এখানে এসে মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, চিনু কিন্তু ওর নির্ভেজাল তপনত্বকেই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। দোষে-গুণে মেশান গোটা মানুষটাকেই সামনে রেখে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

কিন্তু চিনু বড় বেশী সাধারণ। একটা সূক্ষ্ম রসিকতা বোঝে না। সংসারের চার দেওয়ালের বাইরের যে কোন প্রসঙ্গে অন্ধ। নিতান্ত চাল-ডাল-মার্কা অতি সাধারণ মেয়ে।

কিন্তু মাঝে মাঝে মন্দিরার সেই প্রশ্নটাই সামনে এসে বিভ্রান্ত করে ওকে। আপনারাই বা মেয়েদের ভালবাসেন কি দেখে। সত্যিই তো, রসিকতা বোঝা, রাজ্যের সংবাদ নখাগ্রে রাখা, কাফে-রেস্তোরায় স্বচ্ছন্দগামিতাই কি মেয়েদের সব পরিচয়? কে জানে? চিন্তার ওলট পালট ঢেউ ভেঙ্গে সিদ্ধান্তের কূলে পৌঁছাতে পারেনা কিছুতেই। মাঝখান থেকে অনিদ্রা রোগটাকেই আরো চড়িয়ে তোলা।

শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে-ফেলা তপন এসব মুহূর্তে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। ভরা-দম টান দিয়ে সামনেটা ধোঁয়াটে করে তুলে মনে মনে তুরীয় সিদ্ধান্তে আসে, অত ভেবে কি হবে। বিয়েতো আর করছি না জীবনে। আমার কাছে চিনুও যা মন্দিরাও তাই। নিছক প্রয়োজনে যার সঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন মিশছি, তার বেশী নয়। বাকী জীবনটুকু স্রেফ্‌ বিড়ি টেনেই স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারব।

ভের

দিনকয়েক যাতায়াত করার পরই জ্যোতি বুঝল এখানে পড়াতে আসা মানে ছাত্রীর সঙ্গে কিছুটা আড্ডা মারতে আসা. উৎসাহ যে কম সুজাতার তা নয়, কিন্তু সেটা পাঠ্যপুস্তক বাদে আর সব প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। বোধহয় একা ঠিক জমছিল না বলে আর একটি বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছে ইদানিং। সেও নাকি ইকনমিকস্‌এ উইক। অবশ্য ভদ্রতা করে জ্যোতির মত নিয়েছিল আগে।

সুজাতার পড়ায় উৎসাহের ব্যাপারটা অবশ্য অভিভাবকরাও জানেন। তবু স্বপনবাবুর দৌলতে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নাতনীর, কিছুক্ষণের জন্য হলেও, অন্তত শুভদৃষ্টি হয় এতেই তৃপ্ত মিঃ কর। মিঃ রাহাও মনে মনে জানেন, মেয়েদের অনেক সময় পড়তে ভাল লাগে বলে মাষ্টারের সাহচর্য চায়, আবার অনেক সময় মাষ্টারের সাহচর্য চায় বলে পড়তে ভাল লাগে। দুটোর কোনটা মুখ্য কারণ সেটা নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি, মেয়ে বই নিয়ে বসছে এতেই তিনি খুশি।

মিঃ রাহা দিন তিনেক ছুটিতে ছিলেন বলে এ-কদিন ভয়ে পড়াতে আসেনি জ্যোতি। কোন্ সময় হঠাৎ সুযোগ পেয়ে এ বাড়ী চলে আসেন কে জানে। আজ মিঃ রাহা অফিসে জয়েন করেছেন এবং যথারীতি বউ-বাহিত হয়ে বাড়ী ফিরে গেছেন সংবাদ পেয়ে পড়াতে এসেছে।

আজকাল বেশ স্বচ্ছন্দগতি ওর এ বাড়ীতে। চাকর বাকররা ওকে চিনেছে। দ্বারোয়ানরাও টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। টাইগার ছাড়া থাকলে পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়ে।

দরজার মুখে এসে ভেতরে দাদু-নাতনীর আলাপ শুনে একটু দাঁড়াল জ্যোতি। আড়াল-আলোচনা থেকে পরবর্তী পদক্ষেপের সহায়ক কিছু শুনতে পেলে সেটাও অনেক লাভ।

—তা না হয় হল, কিন্তু গিন্নীর পড়াশুনাটা কেমন চলছে বললে না তো।

সুজাতা উল্লসিত স্বরে বলল, খুব ভাল। মাষ্টার মশায় এত সুন্দর বলেন না!

মিঃ কর কপট গাম্ভীর্যে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছিল, পড়ার থেকে শোনাটাই বেশী হচ্ছে। দেখ শেষ পর্যন্ত শোনাটা আবার কানের ভেতর দিয়ে মরমে না পশে।

সুজাতা চটুল ধমক দিল, আহা, অসভ্য! সব তাতে ইয়ে।

জ্যোতি অস্বস্তি অনুভব করল। জানে জ্যোতি, এ সব নিছক ব্যক্তিগত হাসিঠাট্টাই, তবু কেমন যেন একটা মাদকতা আছে এ ঠাট্টাগুলোর ভেতর। ওদিক থেকে ঝিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে গেল জ্যোতি।

মিঃ কর হেসে বললেন, আসুন স্বপনবাবু, আসুন। টাইগারের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বুঝি, আগের মত আর আগমণ ঘোষণা করেনা তো।

একটু হাসল জ্যোতি, আমাকে ভয় দেখানো যে শক্তির অপচয় সেটা টের পেয়েছে বোধহয় এতদিনে।

মিঃ কর ঠিক বুঝলেন না। বললেন, কেন?

—মাষ্টাররা যে সব চেয়ে নিরীহ প্রাণী সেটা টের পেয়েছে।

মিঃ কর হাসলেন, আর নিরীহ নেই হে। আমাদের দাবী মানতে হবে মাথায় ঢোকার পর থেকে আর বুনো রামনাথ নেই মাষ্টাররা।

জ্যোতিও হেসে বলল, কিন্তু সে যুগে বুনো রামনাথরা অন্তত তেঁতুলপাতাটা বিনে পয়সায় পেতেন। কিন্তু এ যুগে সেটুকুও যে শিক্ষকদের ধার করে কিনতে হয়।

সুজাতা টের পেল দুজনেই হেসে আলোচনা করছে কিন্তু আলোচনার পিছে ক্রমেই উত্তাপ বাড়ছে। মাঝখানে ছেদ টানবার জন্য বলল তাই, মাষ্টারমশায় আমি যাচ্ছি, আপনি আসুন।

মিঃ কর সুজাতার উদ্দেশ্যটা বুঝলেন। বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের

সময় নষ্ট করবনা আর। স্বপনবাবুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেই কেমন যেন তর্ক শুরু হয়ে যায়। অবশ্য আমি এতে ক্ষুণ্ণ হই না। ডিবেট্ আর ঝগড়া এক নয়।

জ্যোতি সায় দেয়, অনেকেই সেটা বোঝেনা বলে অনর্থ ঘটায়। আমিও কিন্তু কিছু মনে করিনা এতে।

সুজাতার দিকে তাকিয়ে মিঃ কর জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, ছাত্রী কেমন বুঝছেন?

—পড়ার বইয়ের চেয়ে বাইরের বইয়ের দিকে বোধহয় ঝোঁকটা একটু বেশী।

তৃপ্তির হাসি হাসলেন মিঃ কর, সেটা এ বাড়ীর ধারা। আমারও এ বয়স পর্যন্ত বইয়ের নেশা কাটল না। গিন্নী, আমার বইয়ের কালেক্‌সনটা স্বপনবাবুকে একদিন—

জ্যোতি কপট বিনয়ের সঙ্গে বলল, দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের পুরো কালেক্‌সনটা আছে দেখে লোভ হচ্ছিল।

মনে মনে অবশ্য বলল, পাতাগুলো কাটা হয়নি দেখলাম।

গর্বের হাসি হেসে বললেন মিঃ কর, হ্যাঁ, ওটা একটা রেয়ার কালেক্‌সন অবশ্য। এইতো কয়েকবছর আগে একটা মরা কোম্পানী থেকে বেশ কিছু ডিভিডেণ্ট পেয়ে গেলাম। ওর দিদিমা বায়না ধরলেন ভাল একটা কুকুর কিনতে হবে। আমি বললাম, না, রবীন্দ্রনাথ। ওর দিদিমার জেদের কাছে অবশ্য হাব মানলাম সেবার।

সোৎসাহে বলল সুজাতা, সেবারই তো টাইগারকে কেনা হল, না?

মিঃ কর সায় দিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু পরের বছরই কিনে ফেললাম রবীন্দ্রনাথের পুরো সেটটা।

জ্যোতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের মত কিছু রবীন্দ্র-ভক্ত আছেন বলেই, নাহলে রবীন্দ্রনাথের বই বোধহয় উইতেই কাটত।

মিঃ কর বিগলিত বিনয় প্রকাশ করলেন, তবু ইচ্ছে মত পড়াশুনার আর সময় পাই কই। এমন ভাবে চারদিকে নিজেকে ছড়িয়ে

দিতে হয়েছে।—তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাকগে, তোমাদের আর ডিসটার্ব করব না। গিন্নী গিয়ে বস, স্বপনবাবুকে একটা কথা বলে এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি।

সুজাতা চলে গেলে মিঃ কর জ্যোতির আরো কাছে এগিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুরে বললেন, আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েষ্ট ছিল স্বপনবাবু। আমাকে একটা ব্যাপারে সামান্য একটু হেল্প করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই, বলুন।—সম্মতি জানাল জ্যোতি।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন মিঃ কর, এই সোমবারই একটা মজদুর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে হবে, অথচ সাত কাজে কিছুতেই সময় পাচ্ছিনা একটু প্রিপেয়ার হওয়ার। এই সভা-সমিতিতে এটেণ্ড করতে করতেই নাজেহাল হয়ে গেলাম, বুঝলেন।

তারপর সামলে নিয়ে বললেন, যাকগে, যা বলছিলাম। শ্রমিকদের ওপর বেশ বড় বড় কিছু মহাপুরুষের কোটেশন্ আমাকে বের করে দিতে পারেন? আমি ঠিক বের করে নেবার সময় পাচ্ছি না কিনা। এই যেমন ধরুন, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ।—তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করেও বোধহয় চতুর্থ কোন দেশীয় মহাপুরুষের নাম স্মরণ করতে না পেরে বিদেশের মুখাপেক্ষী হলেন।—বাইরের হলেও হয়, যেমন, বার্নার্ড শ', রোম্যাঁ রোলাঁ, আইসেনহাওয়ার—।

বোধহয় থেমে শেষ নামটা প্রসঙ্গে আর একবার ভাবতে যাচ্ছিলেন। জ্যোতি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, চার্লস লটন, ব্র্যাডম্যান—

সোৎসাহে সায় দিলেন মিঃ কর, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতের কাছে যা যা পান আর কি। সব সময় নামগুলো ছাই মনেও পড়ে না। বয়সও তো কম হলনা।

মনে মনে বলল জ্যোতি, কোন বয়সেই পড়ত না। প্রকাশ্যে বলল, আচ্ছা, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।

কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ কর, কিন্তু আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?

জ্যোতি কপট ক্ষোভের সঙ্গে বলল, দেখুন, নিজেদের পেটের চিন্তা করতে গিয়ে বড় কিছুই করতে পারি না। তবু জনসাধারণের, দেশের, দশের কোন বড় কাজে ইনডাইরেক্ট কোন হেল্প করতে পারলেও কিছুটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।

মিঃ কর আর আটকালেন না জ্যোতিকে। বললেন, যান, আপনার ছাত্রী বোধহয় বসে আছে।

সিঁড়ির মুখ থেকেই দেখতে পেল জ্যোতি তুষারকে। সুজাতা আর প্রিয়ার সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে। হাতে ব্যাড্মিনটন র‍্যাকেট্। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল জ্যোতি। কারণ, আজকাল দেখা হলেই কেন যেন তুষার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে ওঠে বিভিন্ন আলোচনায় বুদ্ধির দীপ্তিতে ওকে ম্লান করে দিতে। জ্যোতি প্রথম প্রথম কিছুটা ভয়ে ও কিছুটা সঙ্কোচে ওর জয়ের পথে প্রতিবন্ধক হত না। কিন্তু ফাঁকা মাঠে গোল দিতে দিতে ক্রমে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল তুষার যে, ফ্রান্সের ভৌগলিক অবস্থানটি না জানা সত্ত্বেও ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে জ্যোতিকে টেক্কা দিয়ে যাবার চেষ্টা করতে শুরু করল। দু'চারটে ভুল উচ্চারণের নাম কোত্থেকে মুখস্থ করেছিল কে জানে। অবশ্য বুঝত জ্যোতি ভাগ্নীর চোখে নিজের স্থান ও মালিক হিসেবে নিজের মান রক্ষার্থেই চাকর, ঠাকুর, মাষ্টার প্রভৃতি জাতীয় জীবদের মাঝে মাঝে নস্যাৎ করে দেওয়াটা ওদের শ্রেণীগত একটি হাতিয়ার।

দিনকয় সহ্য করে একদিন সুজাতা ও চেয়ার পরিষ্কারে ব্যস্ত চাকরটার সামনেই জ্যোতি হেসে শুদ্ধ করে দিয়েছিল কয়েকটি ফরাসী লেখকের নাম। তারপর ইচ্ছে করেই আলোচনাটাকে খেলাধুলার মাঠে পৌঁছে দিয়ে হালের ফরাসী খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে পর্যন্ত এমন তথ্য পেশ করতে শুরু করল যে তুষারের এন্‌গেজমেন্টের দোহাই দিয়ে কেটে পড়া ছাড়া উপায় থাকল না। আর সেদিন প্রথম বুঝল তুষার, যত মুখচোরা ও গোবেচারী বলে ভেবেছিল ঠিক তা নয় এই ছোকরা মাষ্টারটি। সেই থেকেই, সুযোগ পেলেই, একটু নেড়ে

চেড়ে দেখে জ্যোতি তুষারের দীপ্তিকে। কেমন যেন একটা প্রতিশোধ স্পৃহা মেটে এতে।

জ্যোতিকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল তুষার, ওঃ, আপনি এসে গেছেন ?

জ্যোতি একটু হাসল, খেলায় ডিসটার্ব করলাম ?

—না না।—বলে একটু হাসল তুষার, খুব জোর পড়াচ্ছেন কিন্তু মাষ্টার মশায়, খেলায় পর্যন্ত ওদের রুচি নেই আর।

প্রিয়া সামনে থাকাতেই যে ইচ্ছে করে তুষার জ্যোতিকে মাষ্টার মশায় বলে সম্বোধন করল সেটা নজর এড়ালনা ওর। একটু হেসে বলল, পড়াটাই খেলা হয়ে উঠেছে বোধহয়, তাই।

সুজাতা অভিমানে ঠোঁট বাঁকাল, বাঃ বেশ ; যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। আপনার ভয়েই পড়ি আর—।

জ্যোতি বলল, আমরা ভয়ে পড়ি বলেই শিক্ষার এই অবস্থা। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেদের ভয় দেখান হয়, লেখাপড়া না শিখলে কুলিগিরিও জুটবেনা, খাবি কি ? মেয়েদের ভয় দেখান হয়, আজকাল লেখাপড়া না শিখলে কেউ বিয়ে করবে না। স্রেফ্ ও দুটো ভয় থেকেই পড়তে শুরু করি আমরা। শিক্ষাটা তাই আমাদের ভয়ের শেখা। পবিণামে সেটাই হয় ভয়াবহ শেখা।

তুষার ভারিক্কি চালে বলল, স্কুল-কলেজগুলো তাহলে তুলে দিলেই হয়।

—উঁহু, সত্যি করে খুলে দিলেই হয়। এ রকম আধ-ভেজান কপাটের ফাঁক গলিয়ে, ভাগ্যবানদের ধরে এনে কেরানীর সিল্ মেরে পেছন দরজা দিয়ে বের না করে দিয়ে, দরজাটা পুরোপুরি সবার জন্য খুলে দেওয়া দরকার।

জ্যোতির কথাগুলো সোজা পথ ছেড়ে এরকম আঁকাবাঁকা পথ ধরলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে তুষার। ওর অনায়াস-লব্ধ স্মার্টনেস ভোঁতাহয়ে আসে। তবু, বোধহয় প্রিয়া সামনে ছিল বলেই চেষ্টাকৃত ভারিক্কী চালে বলল তুষার, বুঝলেন, মাষ্টার মশায়, বাঁকিয়ে

হুমড়িয়ে বললেই বক্তব্য প্রমাণ করা যায় না। সেজন্য যুক্তি চাই।

হাত জোড় করে একটু হেসে বলল জ্যোতি, স্বীকার করছি ওটা সম্বন্ধে আমি একটু কঞ্জুষ! যত্রতত্র ওটা দরাজ হাতে বিলোতে কুণ্ঠা বোধ করি।

সুজাতা ও প্রিয়া বসে বসে উপভোগ করছিল আলোচনার ধারা। সুজাতা অবশ্য কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আজকাল মামা বনাম মাষ্টার মশায়ের এই অঘোষিত দ্বন্দ্বে। মামার কোণঠাসা অবস্থায় মনে মনে কেন যেন খুশিও হয় কিছুটা সুজাতা। কিন্তু প্রিয়ার উপস্থিতির জন্যই বোধহয় আজ মামার বেকায়দা অবস্থা দেখে ও মাঝখানে বাধা দিল।

—ব্যাস্ ছোটমামা, এবার কেটে পড় তো। প্রয়োজন হলে পড়ার পরে এসে তর্ক জমিও।

তুষার বেঁচে গেল যেন। তবু প্রিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, দেখ, তর্ক করা তাদেরই পোষায় যাদের হাতে ছিনিমিনি খেলবার মত অঢেল সময় থাকে। আমাদের মত কাজের চাপে পিষে যেতে হলে মুখ দিয়ে অনেকেরই কথা বেরুতো না।

জ্যোতি গম্ভীর হয়ে বলল, এটা অবশ্য অনস্বীকার্য। হাতে অঢেল সময় থাকার মত দুর্ভাগ্য না ঘটলে কেউ তর্ক করে সময় নষ্ট করে না। আজকাল যে পথেঘাটে ট্রামেবাসে চারদিকে এত তর্কের ঢেউ তার একমাত্র কারণও সেটাই—বেশীর ভাগ লোকেরই কাজ নেই। বেকার। হাতে অঢেল সময়।

এতক্ষণে তুষারের ঠোঁটে বিজয়ের হাসি ফুটল। টাইটা ঠিক করতে করতে বলল, তাহলে স্বীকার করলেন তো?

জ্যোতি হেসে বলল, তর্কের আগেও সেটা স্বীকার করতাম আমি। যাকগে, কিছু মনে করবেন না কিন্তু, তর্কটা আমার নেশা।

তুষার হাতের র‍্যাকেট্‌টা ঘুরাতে ঘুরাতে ওকে ক্ষমা করার ভঙ্গীতে বলল, না না, মনে করার কি আছে। আচ্ছা চলি, পড়ুন আপনারা।

প্রিয়া খিলখিল করে হেসে উঠল, ওর হাতিয়ারেই ওকে বেশ ঘায়েল করলেন তো। কিন্তু জয়ের তৃপ্তি নিশ্চয়ই পেলেন না।

প্রিয়ার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সামনে বই টেনে নিল জ্যোতি, আজ কি পড়া আছে দেখি।

মুখ শুকিয়ে গেল সুজাতার। আবার পড়া! স্বপনবাবুটা কী। যেন মাইনে করা মাষ্টার। আগের সমস্ত অজুহাতগুলোই পুরানো হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ প্রিয়াকে অবলম্বন করে পড়ার সামনে একটা প্রাচীর তোলার চেষ্ট করল সুজাতা।

—জানেন মাষ্টার মশায়, আপনাকে প্রিয়ার আর একটা পরিচয় দেওয়া হয়নি। আপনাদের মন্দিরা দেবীর এক মাসতুতো বোন ওর বন্ধু।

প্রিয়া সবে দিনকয় থেকে আসছে। ওর সম্বন্ধে প্রথম জড়তাটা কাটেনি এখনও জ্যোতির। তাছাড়া ওর নামটাও ওর অস্বস্তির কারণ হয়েছে। ছাত্রী হিসেবে প্রিয়ার চেয়ে যে কোন ক্ষ্যান্তমণি, আন্না[illegible]ও অনেক প্রীতিপ্রদ নাম। আজও এই নতুন পরিচয়ে খুব বেশী [illegible]আঙ্খিত হবার মত কোন কারণ খুঁজে পেলনা জ্যোতি। মন্দিরা নামে অফিসের কোন মেয়ের নাম শুনেছে কিনা তাও ঠিক খেয়াল করতে পারল না। প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে দায়-সারা একটা উত্তর দিল, ও, তাই নাকি।

প্রিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলল, কাল অনেক দিন পর হঠাৎ মন্দিরাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।

সুজাতা গোপনে ছোট্ট একটা চিমটি কাটল প্রিয়াকে। চোখ এড়ালনা জ্যোতির। সামান্য নার্ভাস বোধ করল এতে। হঠাৎ বলে ফেলল, মন্দিরাদি কে, মানে—।

সুজাতা অবাক হল, সে কি, চিনতে পারলেন না? আপনাদের অফিসের ষ্টেনো, মিস মিত্র।

ভ্রম সংশোধন করে বলল জ্যোতি, ও, মিস্ মিত্রের কথা বলছ?

এবার প্রিয়া চিমটি কাটল সুজাতাকে। আবার অস্বস্তি অনুভব

করল জ্যোতি। দাদার সঙ্গে মেয়েটার প্রেমের সম্পর্ক টম্পর্ক নয়তো। এত উপভোগ করছে কেন ওরা প্রসঙ্গটা।

জ্যোতি এবার কিছুটা বিরক্তও হল। সিভিক্স বইটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করল, আজ কি পড়ানোর কথা ছিল, ভ্যালু অফ্ মানি ?

সুজাতা ও প্রিয়া দুজনেই টের পেল মাষ্টার মশায় চটেছেন। আপাতত তাই আর আপত্তি জানাল না। বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ানোর পরই লক্ষ্য করল জ্যোতি, ছাত্রী দুজনই অর্থনীতির পিছনে অনর্থক ছোটার অর্থ খুঁজে না পেয়ে মনকে ছুটি দিয়ে বসে আছে। রাগ হলনা জ্যোতির, মনে মনে হাসি পেল। ভাবল মরুকগে ছাই, দুদিনের খেলা-খেলা মাষ্টারী, আমি কেন খেটে মরি। আস্তে বইটা বন্ধ করে দিল জ্যোতি। কিন্তু জ্যোতি কিছু বলবার আগেই হঠাৎ বলে বসল প্রিয়া, মাষ্টার মশায় একটা কথা বলব ?

জ্যোতি গম্ভীর ভাবেই বলল, আমার অনুমতি না পেলেও কি সেটা কোনদিন আটকে থাকে ?

একটু লাজুক লাজুক হেসে বলল প্রিয়া, আমি না জীবনে ফরাসী ভাষা শুনিনি। কিছু বলুন না।

আচমকা প্রস্তাবটায় একটু হকচকিয়ে যায় জ্যোতি।—ফরাসী ভাষা !

কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রিয়া।—ইস, মন্দিরাদির কাছে শুনিনি বুঝি। মন্দিরাদিকে একদিন ফরাসী কবিতা শোনাননি আপনি ?

ফরাসী কবিতা! উদ্গত হাসিটা কোনমতে চাপল জ্যোতি। তপুদা শোনাচ্ছে ফরাসী কবিতা! মায়া হল সেই অপরিচিতা ভদ্র-মহিলার জন্য। আপনি জানেন না আপনি কি শুনিতেছেন! বিনয়ের সঙ্গে বলল, আরে দূর, ও একটা জানা নাকি ? সমুদ্রে নুড়ি কুড়োচ্ছি।

সুজাতা সমর্থন জানাল প্রিয়াকে, আমিও লজ্জায় বলতে পারছিলাম না। সত্যি, বলুন না একটু।

জ্যোতি হেসে বলল, কিন্তু বললেও বুঝবে কিছু ?

সুজাতা ঘাড় কাত করে বলল, না বুঝলেই বা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও কি সব কিছু বুঝি, কিন্তু ছোটমামার সঙ্গে প্রত্যেকবার সারারাত জেগে তো শুনি।

জ্যোতি কি যেন একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। না, এরা তুষার নয়। এবা ওর ছাত্রী। এদের কাছে জিতেও তৃপ্তি নেই। ঘড়ি দেখে বলল, আচ্ছা সে আর একদিন হবে। একদিন সময় নিয়ে বেশ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে দিয়ে শোনান যাবে। আজ বরং উঠি।

ওর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে হর্ণের শব্দ শুনে উঠে গেল সুজাতা। জানালা দিয়ে নিচে উঁকি মেরে খুশিতে লাফিয়ে উঠল।—আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি। বাবা এসেছেন বোধহয়।

মাথায় বজ্রাঘাত হল জ্যোতির। হঠাৎ অস্ফুটে বলে ফেলল, বাবা! এই সেরেছে।

সুজাতা একটু অবাক হল।—কেন?

জ্যোতি সামলে নিয়ে বলল, না, মানে, মামাতো বোনের বিয়ে বলে অফিস থেকে কেটে ছিলাম কিনা। উনি যদি—।

সুজাতা দুষ্টু হেসে বলল, ও, এই কথা। তা অফিসাররাও জানেন যে অফিস ভর্তি যুধিষ্টির মাইনে দিয়ে পুষছেন না তারা। ঠিক আছে, আমি বাবাকে বলবনা যে আপনি এসেছেন, তাহলেই তো হল। দাদু বললেও বলে দেব শরীর খারাপ বলে চলে গিয়েছেন।

তারপর প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রিয়া একটু বস ভাই, আমি আসছি।

আতঙ্কে জ্যোতির তালু শুকিয়ে এল। এ ধরনের বিপদ যে কোন দিন ঘটতে পারে জানত। কিন্তু তার সঠিক রূপটা জানা ছিলনা। বরাবরই ভেবেছে, সময় মত ঠিক ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু আজ প্রথম উপলব্ধি করল, কল্পনা আর কাজে ম্যানেজ করার ভেতর অনেক পার্থক্য। মনে মনে ছটফট করতে লাগল বসে বসে। আর ঝড়ের বেগে ভেবে চলল ইতিকর্তব্য।

জ্যোতিকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করছিল

প্রিয়া। শেষ পর্যন্ত আর কোন প্রসঙ্গ খুঁজে না পেয়ে বলল ও, ফরাসী ভাষাটা খুব মিষ্টি, না ?

অন্যমনস্ক জ্যোতির কানে শুধু শেষ কথাটাই গেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, আবার মিষ্টি কেন, থাক।

অবাক হল প্রিয়া, মিষ্টি! আমি তো ফরাসী ভাষার কথা বলছিলাম। আপনি কি ভাবছিলেন ?

লজ্জিত হল জ্যোতি। একটু হেসে বলল, ও, না, মানে, আমি ঠিক কিছু ভাবতে পারছিলাম না।

মনে মনে বুঝল জ্যোতি যে কোন মুহূর্তে প্রিয়ার কাছে ওর নার্ভাসনেস্ ধরা পড়ে যেতে পারে। পড়ানো হয়ে গেছে, এখন চলেও যেতে পারে, কিন্তু সামনের পথ বন্ধ। প্রিয়ার মুখোমুখি বসে থাকতেই হবে। শেষ পর্যন্ত প্রিয়াকে সরানোর জন্যই বলল জ্যোতি, আচ্ছা, তুমি এ বাড়ী প্রায়ই আস, না ?

প্রিয়া বলল, হ্যাঁ, প্রায় নিজেদের বাড়ীর মতই হয়ে গেছে। কেন ?

—এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পার ? অবশ্য অসুবিধে হলে—।

উৎসাহে লাফিয়ে উঠল প্রিয়া, না না, অসুবিধের কি আছে ? আমি এক্ষুনি আনছি।

প্রিয়া বেরিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে ঝুল বারান্দায় গেল জ্যোতি। এবং চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাতে গেল। এবং এক সময় মনে হল বোধহয় একটা পথও পেয়ে গেছে। ঝুল বারান্দার কোণ দিয়ে একটা ঘুরানো সিড়ি নেমে গেছে পেছনের দিকে। মোটর গ্যারেজের সামনে। সেখান থেকে ছোট্ট একটা চত্তর পেরিয়ে গেলে কোমর সমান উঁচু একটা প্রাচীর। প্রাচীরটার ওপারে একটা গলি। মুহূর্তে সিদ্ধান্তে এল জ্যোতি, য পলায়তে স জীবতি।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল জ্যোতি। পকেট থেকে ঝটপট পেনটা বের করে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হল প্রিয়া। মাষ্টার মশায় কোথায় গেলেন!

টেবিলের উপর চা রেখে বাইরে আসতেই সুজাতার সঙ্গে মুখোমুখি।—স্বপনবাবু কোথায় গেলেন রে?

সুজাতা আমল দিলনা। বলল, যাবেন কোথায়? বোধহয় বারান্দায় আছেন।

কিন্তু বারান্দায় পাওয়া গেলনা। এবং আশেপাশেও না। দুজনেই বোকা বনে গেল। জলজ্যান্ত লোকটা বসেছিল; যাবে কোথায়?

এদিক ওদিক খুঁজে ঘরে ফিরে টেবিলের কাছে আসতেই এতক্ষণে ওদের চোখে পড়ল ভাঁজ করা চিঠিটা। চিঠিটা খুলে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেটার উপর। ছোট্ট দুলাইনের চিঠি:

সুচরিতাসু,

কেমন যেন ফিট্ ফিট্ লাগছিল। সেই ফিটের ব্যামোটাই বোধহয়। তোমাদের বিব্রত করা হবে ভয়ে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল তাই। আর কাউকে এ কথা জানিও না। এই ফিটের ব্যামোটা সম্বন্ধে আমার একটা সঙ্কোচ আছে। ইতি, মাষ্টার মশায়।

চৌদ্দ

বেশ কিছুদিন গুম মেরে বসে থাকার পর আবার বিপুল উদ্যমে ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তুষার। সাতবার ম্যাট্রিক ফেল ও ছবার ব্যবসায় ফেলের পব তুষারকে নিয়ে রীতিমত চিন্তায় পড়েছিলেন মিঃ কর। মনে মনে ভাবছিলেন এবার বিলেত পাঠিয়ে ওখানকার একটা গোজামিল কোন উপাধি অন্তত আনিয়ে না নিতে পারলে আর মুখ থাকেনা। অর্থোপার্জনের জন্য নয়, সেটা হয়তো ওর প্রয়োজন হবেনা বাবার দৌলতে, কিন্তু ওঁছা অখ্যাতিটা কাটিয়ে না আনতে পারলে নিজেরও সম্মান থাকেনা।

অবশ্য তুষার আদৌ বিশ্বাস করত না যে, ওর সম্বন্ধে এতটা নিরাশ হবার কারণ আছে। সাফল্য সব সময় প্রতিভার উপর নির্ভর করেনা, ভাগ্যের উপরও করে। ছবারের পরও নতুন কোন ব্যবসার ফিকিরে ফিরছিল তাই ও। হঠাৎ এ সময় যোগাযোগ হয়ে গেল সোমানীর সঙ্গে। স্কুলে একসঙ্গেই পড়ত ওরা, একসঙ্গেই ফেল করত। স্কুল ছাড়ার পর আর যোগাযোগ ছিলনা। সোমানীও টোপ ফেলে ফেলে দেখছিল এতদিন কোথায় মাছ ঘাই দেয়। মণিকাঞ্চন যোগ হল ওদের পুনর্মিলনে।

দুজনে মিলে সিদ্ধান্তে এল, অন্তত হাজার দশেক টাকা হলে একটা ভাল ব্যবসা শুরু করা যায়। কিন্তু সমস্যা হল ঐ প্রথম হাজার দশেক। একটি বাঙ্গালী ও একটি মারোয়াড়ী মাথা নতুন করে ভাবতে বসল আবার। এবং আশ্চর্য, বাঙ্গালী মস্তকটিই প্রথমে নড়ে উঠল। ঠিক আছে, বেকারদের নিয়ে একটা ব্যবসা করলে হয়।

মাড়োয়ারী মস্তক বিস্মিত হল, অর্থাৎ ?

খুলে বলল তুষাব ওর প্ল্যান। সোমানী রোমাঞ্চিত হল। কিন্তু তবু সমস্যা রয়ে গেল শ'পাঁচেকের। প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য। সোমানী বাড়ীর সঙ্গে গোলমাল করে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় শূন্য পকেটে। সুতরাং ভারটা পড়ল তুষারের ওপরই। ঠিক হল পরে লাভ থেকে ও কেটে নেবে টাকাটা।

কিন্তু তুষার যতদূর সম্ভব বাবাকে এড়িয়ে চলত। নিজে সাহস করে বলতে পারছিলনা তাই কথাটা। অগত্যা জামাইবাবুর স্মরণাপন্ন হতে হল। শালার কড়া তাগাদায়, বাড়ীতে কোন রকমে ধাপ্পা-টাপ্পা দিয়ে, সেই প্রস্তাব নিয়েই সেদিন এসেছিলেন এ বাড়ীতে মিঃ রাহা। জ্যোতির যেদিন পালিয়ে বাঁচতে হল।

বেকার-ব্যবসা শুনে বাবাও কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। জামাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটা কি রকম ব্যবসা ?

মিঃ রাহা নিজেও অবশ্য জানতেন না সেটা। বাধ্য হয়ে বলেছিলেন, সেটা অবশ্য আমিও-ঠিক ডিটেল্‌স-এ জানি না। তবে এবার ওর নিজের

ওপর খুব সেল্‌ফ কনফিডেন্স আছে দেখলাম। টাকাও অবশ্য সামান্যই বলছিল। বসেই তো আছে, দেখুন না পরীক্ষা করে।

শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন বাবা। এবং আড়াল থেকে বাবার সম্মতি টের পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল তুষার।

আর, তার মাত্র দিন পাঁচেক পরই বড়বাজারের একটি কুঠুরিতে জন্ম নিয়েছিল নতুন একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। ইণ্টারন্যাশনাল্ ট্রেড্ ব্যুরো।

আজ সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ইণ্টারভিউ পর্ব।

বাইরে শ'খানেক অধৈর্য প্রার্থী। আর ভেতরে বসে ছটফট করছে কোম্পানীর দুই ডাইরেক্টার তুষার ও সোমানী। সামনে একগাদা আবেদনপত্র। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে তুষার।

—নাঃ, জামাইবাবু এখনও এলনা, কি করে সামলাই বল তো!

সোমানীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, কখন আসতে বলেছিলে?

—আসার কথা তো বেলা বারটার মধ্যেই। ওঁর ছুটি বলেই তো আজ ডেট ফেললাম। অবশ্য কারণটা বলিনি, শুধু অফিস দেখতে আসতে বলেছিলাম।

বেয়াবা এসে বিরাট স্যালুট করে সংবাদ দিল, স্যার, বাবুরা বাইরে বহুৎ হল্লা কইরতেছেন।

মুখ শুকিয়ে গেল তুষারের, কেন?

—বইলছেন, একটা বাইজে গেল, মোলাকাৎ কব হোবে।

তুষার গাম্ভীর্য রক্ষা করে বলল, যাও, বল ব্যবস্থা হচ্ছে।

বেয়ারা বেরিয়ে গেল। সোমানী করুণ ভাবে বলল এবার, মিছামিছির ব্যাপারে এত বাছাবাছির কি আছে। সবাইকেই চাকরি দিয়ে দাও না।

খেঁকিয়ে উঠল তুষার, তোমার যেমন বুদ্ধি! প্রথমেই সন্দেহ করুক যে চারশ' বিশের কারবার।—তারপর একটু থেমে সোমানীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল, আচ্ছা, এক কাজ কর।

না, তুমিই অফিসার হিসেবে ইন্টারভিউটা নিয়ে নাওনা। মেয়ে দেখতে আর কেরানী বাছতে গিয়ে যা খুশি উদ্ভট প্রশ্ন করা যায়, কেউ কিছু মনে করে না।

সভয়ে হাত জোড় করল সোমানী, মাপ কর ভাই, আমার এমনিই কেমন যেন গলা শুকিয়ে আসছে। বরং তুমি চেষ্টা করে দেখ। তোমার চেহারাটাও আমার চেয়ে ভাল।

বেয়াবার পুনর্প্রবেশ।—বাইরে বাবুরা হল্লা কইরতেছেন হুজুর।

সোমানী ঘাবড়ে যায়।—কি বলছে রে?

তুষার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে চেয়ারে। টাইটা ঠিক করে নেয় একবার। বোধহয় প্রার্থীদের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়েই কালো চশমাটা পরে নেয়। নতুন করে পাইপটা ধরায়। তারপর একটু কেশে গম্ভীর স্বরে বলে, ঠিক আছে, বাবুদের তৈরী হতে বল।

বেয়ারা খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল।—জী হুজুর।

বাবুরা বেয়াড়া হয়ে উঠলে প্রথম ধাক্কাটা যে বেয়ারাদের ওপর দিয়েই যায় সে অভিজ্ঞতা আছে ওর।

সর্বশেষে ডাক পড়ল দীপেনের। ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে আজকাল ও নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে এদের ভাবগতিক প্রথম থেকেই ভাল লাগছিল না ওর। তবু অপেক্ষা করছিল এসে পড়েছে বলে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

অবশ্য খুব বেশীক্ষণ ওর অপেক্ষা করতে হয়নি। ইন্টারভিউ সবারই মিনিট পাঁচেকের ভেতরই শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এ থেকে অনুমান করল দীপেন, ভেতরে নিজেদের লোক ঠিক হয়েই আছে। ইন্টারভিউটা নেহাৎ লোক দেখান। ঘরে ঢুকেই একবার সন্ধানী চোখে চারদিক দেখে নিল দীপেন। কর্তা দুজনকেও। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের গাম্ভীর্যের পোষাকের তল থেকে, খুব কচি না হলেও, কাঁচা লোকদুটো ধরা পড়ল। অবশ্য টাকার জাগ পেলে এরাই রাতারাতি পেকে যাবে, তা জানে ও।

দীপেন নমস্কার করে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তুষার গম্ভীর ভাবে নড্ করল, বসুন।

সামনে খোলা দীপেনের আবেদন পত্রটায় চোখ বুলাতে লাগল তারপর। এবং মনে মনে ঘামতে থাকল বি. এ পাশ এই ভদ্রলোককে কি জিজ্ঞেস করা যায় ভেবে। আসলে ম্যাট্রিকুলেটদেরই ডেকেছিল ওরা। বড় সাপ নিয়ে খেলবার ঝুঁকি না নেবার জন্য। কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্যই বোধহয় কি করে এ রকম দুচারটা আবেদনপত্র নজর এড়িয়ে গেছে ওদের।

মনে মনে এবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল তুষার, আপনি এর আগে কোথায়ও কাজ করেছেন?

—আজ্ঞে না।

—অফিস সম্বন্ধে কোন প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স নেই তা হলে?

—আজ্ঞে না। সেজন্য অন্তত একবার যে সুযোগটা পাওয়া দরকার সেটাও কেউ দয়া করে দেননি আমাকে।

সোমানী এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে গম্ভীর চালে জিজ্ঞেস করল, তা আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে মাত্র একশ দশটাকার চাকরি করতে চাইছেন কেন?

দীপেনের প্রশ্নটি অপমানকর মনে হল। বলে ফেলল, মাত্র দশ টাকার কাজও পাচ্ছিনা বলে।

তুষারেরও ততক্ষণে ভয় কিছুটা কেটেছে। সোমানীর হৃত সম্মান উদ্ধারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, কিন্তু আপনারা এভাবে ভিড় করলে শুধু ম্যাট্রিকুলেটদের কি হবে?

একটু বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিল দীপেন, পিছে কেউ না থাকলে বেয়ারা, থাকলে অফিসার।

হাজার হলেও মালিক, আঁতে ঘা লাগল সোমানীর। বলল, আপনি চাকরি করতে এসেছেন মনে হয় না।

এতক্ষণে বুঝেছে দীপেন চাকরীর সম্ভাবনা নেই ওর। বলল, করতে নয়, আপাতত চাইতে। কোন অন্যায় হয়ে থাকলে মাপ চাইছি।

তুষার মনে মনে এই ফাঁকে কথা হাতড়াচ্ছিল। ওদের কথা শেষ হয়ে গেলেও নতুন কথা খুঁজে পেলনা তুষার। অস্বস্তিকর একটা নিস্তব্ধতা ছেয়ে এল ঘরটায়।

বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল দীপেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?

তুষার একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, হ্যাঁ, আচ্ছা, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত?

প্রশ্নটায় কৌতুক বোধ করল দীপেন। সামান্য চিন্তা করে বলল, ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, কত স্যার?

তুষার প্রশ্ন করেই বুঝেছিল কিছুটা বেখাপ্পা হয়ে গিয়েছে প্রশ্নটা। তবু গম্ভীর স্বরে বলল, ইণ্টারভিউটা আমার হচ্ছে না, আপনার।

দীপেন বিনয়ের সঙ্গে বলল, সরি; আই বেগ টু বি এক্সকিউজড্।

সোমানী এতক্ষণে একটা কাজের কথা তুলল, আমাদের প্রধান কাজ কিন্তু অর্ডার সিকিওব করা, পারবেন তো।

দীপেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আমার পজিসনটা সিকিওর্ড্ হলে পারব না কেন স্যার।

তুষার এবার আসল প্রশ্নে এল, সিলেকটেড্ ক্যাণ্ডিডেটদের কিছু টাকা ডিপোজিট্ রাখতে হবে, পারবেন্ তো? অবশ্য রিফাণ্ডেবল্ সেটা।

সামান্য ভেবে দীপেন বলল, খুবই কষ্ট হবে, তবু প্রয়োজন হলে দিতেই হবে। আপনাদের রেজিস্টার্ড কোম্পানী যখন তখন তো ভয়ের কিছু নেই।

সোমানী ও তুষারের দৃষ্টি বিনিময় হল একবার। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলেন মিঃ রাহা।

সোমানী প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল, এইতো জামাই—। কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না টেবিলের নিচে তুষারের জুতোর চাপ খেয়ে। তুষার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে মিঃ রাহার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, মিঃ রাহা। আমাদের আর একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

দীপেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। তুষার বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। সময় মত খবর পাবেন।

দীপেন বেরিয়ে যেতেই মিঃ রাহা রাগত ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন, কি করলে বল তো? আমি অন্যত্র চাকরি করি, আমাকে এসব ভাওতার মধ্যে—।

তুষার নিচু হয়ে পায়েব ধুলো নিল।—এসব বিপদ আপদে যদি কাজে না লাগেন তবে আর কোন ভরসায় বোনকে দিয়েছিলাম বলুন তো। যাক, ছোকরা তবু বুঝে গেল যে হোমরা চোমরা লোকও আমাদের মধ্যে আছে।

মিঃ রাহা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তুমি শালা আমাকে একটা বিপদে না ফেলে ছাড়বে না দেখছি।

তুষার হেসে বলল, দাদা, এক মাসের ব্যাপার। তারপর তুমি কার কে তোমার; সব ফাকা। সত্যি ব্যবসাতো শুরু তখন থেকে। কর করে দশ হাজার মূলধন নিয়ে।

অবাক হলেন মিঃ রাহা, সেকি? অত টাকাকে দেবে তোমাদের।

পাইপে একটা মোক্ষম টান দিয়ে এক গাল ধুঁয়ো ছাড়ল তুষার, মা সরস্বতীর অনাথ সন্তানরা। স্কুল কলেজ থেকে মৌমাছির ঝাঁকের মত পিলপিল করে সব পণ্ডিত বেরুচ্ছে ফি বছর, কিন্তু বসবার জায়গা পাচ্ছে না। পেট টিপে মধু বের করবার এই তো সুযোগ দাদা।

— কিন্তু মধুর পরিমাণটা একটু বেশী আশা করছ না?

তুষার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না। সোজা হিসেব। পঞ্চাশ জনকে চাকরি দিচ্ছি। মাথা প্রতি ডিপোজিট দিচ্ছে মাত্র দুশ টাকা। তাহলে একুনে হল—।

মিঃ বাহা চিন্তিত হলেন, কিন্তু সামলাতে পারবে তো?

হাসল তুষার, বেসামাল হলেই বা। আপনাদের মত বড় বড় সব মাথার সঙ্গে চুলে চুলে যখন গিট বাঁধা তখন পা টলে গেলেও আপনাদের মাথার জোরেই ঠিক উঠে দাঁড়াব। যাকগে, কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

—কফিই বল।

বেল বাজাল তুষার।৫ বেয়ারা এসে স্যালুট করে সামনে দাঁড়াল তুষার গম্ভীর স্বরে অর্ডার দিল, কফি।

পনর

তপনেব মার মুখে তপনের মতামত জেনে বিজয়বাবু সামান্য দুঃখিত হলেন। ঠিক প্রবল আশা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, তবে মনে মনে তপনের সঙ্গে চিনুকে ভাবতে ভাল লাগত। কেমন যেন মনে হত ওদের বেশ মানাবে। ওরা দুজনেই বড় দুঃখী আর ভাল।

সংবাদটা যথা সময়ে চিনুরও কানে উঠল। শুধু দুঃখিতই নয়, প্রচণ্ড আঘাত পেল চিনু। মনকে বারে বারে বোঝানোর চেষ্টা করল, তপনদার সঙ্গে কোনদিনই তো আমার প্রেমের সম্পর্ক নয়। একটা সহজ সম্পর্ক ছিল, এই পর্যন্ত। কোনদিন এ প্রসঙ্গে কোন কথা হয়নি বা কথা দেয়নি তপনদা, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতারও প্রশ্ন ওঠে না। তবে কেন একে প্রবঞ্চনা বলে মনে করি। একে তো সহজ ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। কত মেয়ে তো বাগদত্তা হবার পরও প্রতারিত হয়। জেঠীমার ঠিক করা পাত্রই বা খারাপ কিসে। বরং ওর তুলনায় আশার অতীত।

কিন্তু অত সহজেই মন বশ মানলনা। বারে বাবে মনে হতে লাগল কি যেন হারাচ্ছি। হয়তো নিজের সঙ্কোচেই হারাচ্ছি। ইতুর সেদিনের কথাটা মনে পড়ছে। কিছু পেতে হলে সব সময় ভিক্ষের আশায় বসে থাকলে হয় না, মাঝে মাঝে দাবীর জোরে জয় করে নিতে হয়। ইতুও বোধ হয় কিছুটা মর্মাহত হয়েছে। ব্যথিত হয়েছে। অথচ গ্রহণ করবার মত কোন সক্রিয় ভূমিকাও খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু দাবীর কথা মনে হতেই নিজে থেকেই সঙ্কোচে পিছিয়ে আসে চিনু। জোর পায় না। দাবীর পিছনে জোর না থাকলে সেটা শেষ পর্যন্ত করুণ আর্তি হয়ে ওঠে। তা বড় লজ্জার। অসম্মানের।

ভেবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না চিনু। হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত এলোমেলো ভাসতে থাকে চিন্তার স্রোতে।

নানা চিন্তায় তপনও কয়েকদিন বিপর্যস্ত ছিল। এখনও মাইনে পেতে দিন কয়েক বাকী। স্বপনের যাবার দিন এগিয়ে আসছে। নতুন কিছু ধারের দরকার। অথচ পুরনো কিছু ধারের তাগাদা এর ভেতরই শুরু হয়ে গেছে। জ্যোতি সেদিন কোন ক্রমে পালিয়ে বেঁচেছে। হেসে হেসেই সে কাহিনী বলছিল বটে জ্যোতি, কিন্তু ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল তপনের। নতুন করে অনুভব করেছিল, এই ভয়ঙ্কর অভিনয়ের করুণ দিকটা। পুরো ব্যাপারটাকেই খেলা খেলা চটুলতায় হাল্কা করে নিয়েছিল মন, বোধহয় নিজের স্বার্থের জন্যই। কিন্তু মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে, বিবেককে পর্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে। মাইনের দিনটা যতই এগিয়ে আসছে এই মনোভাবটা ততই প্রকট হচ্ছে। সমস্ত ঘটনাটার সঙ্গে একটা ঘৃণ্য অর্থের যোগ আছে, সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

দাদাকে গম্ভীর দেখে হেসে বলেছিল জ্যোতি, সেকি, এতেই ঘাবড়ে গেলে নাকি? আমার তো বেশ হুইলে মাছ খেলাচ্ছি মনে হচ্ছে।

তপন চিন্তান্বিত ভাবে বলেছিল, কে কাকে খেলাচ্ছে বোঝা মুস্কিল। এত ঝুঁকি নিয়ে চলতে পারছিনা। ভীষণ চাপ পড়ছে মনের ওপর। ঠিক আছে, হঠাৎ বন্ধ করাটা দৃষ্টিকটু হবে, আর দু চার দিন যাক নাহয়, তারপর অসুখের অজুহাত দেখিয়ে ওদিকটা বন্ধ করে দিতে হবে। এত দিক সামলান সম্ভব নয়।

জ্যোতি একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, গোটা ব্যাপারটাই তোমার, কাজেই তোমার চেয়ে ভালভাবে সবদিক আমি অবশ্যই চিন্তা করতে পারব না। তবে আমার দিক থেকে তোমাকে শেষ কথা জানিয়ে রাখি, আমার কথা চিন্তা করনা তুমি। আমি যেমন করে

পারি ম্যানেজ করে যাব। আমার কথা ভেবে কিন্তু তুমি মন খারাপ করনা।

জ্যোতির কথাটাও যে না ভেবেছে এ কদিন তা নয়, তবু সেটাও নিজের ভাবনার সঙ্গেই জড়িত। নিজের অক্টোপাস চিন্তার সঙ্গে। মন্দিরাও যার আর একটি বাহু। ইদানিং মন্দিরার অতি ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগছিলনা তপনের। খুব বেশী মেয়েব সঙ্গে মেশার সুযোগ কোনদিনই হয়নি ওর। মেয়েদের মনের গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে তাই অভিজ্ঞতা কম। অবশ্য ও ব্যাপারটা দেবতারাও সঠিক জানেন না সেটাই সান্ত্বনা। তবে বেশ কিছু ছেলে বন্ধু আছে মন্দিরার, জানে তপন। তাদের সবার সঙ্গেই হয়তো মন্দিরার এই রকম সচ্ছন্দ সম্পর্ক। হয়তো মিথ্যেই তপন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এর ভেতর একটা বিশেষ রঙ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে রঙটা যদি সত্যি হয় তা হলে সেটাও ভয়ের। সেটা সত্য হবার দুটো রূপ আছে। হয় ওর মুখোসটাই আকর্ষণ করেছে মন্দিরাকে অথবা মানুষ হিসেবে সত্যি তপন। প্রথমটা ওর অস্তিত্বের প্রতি অপমান। দ্বিতীয়টা আতঙ্ক। কারণ ওর এ অবস্থায়, এবং হয়তো জীবনে কোনদিনই, ওসব সম্ভব হবেনা ওর পক্ষে। তাছাড়া এ চাকরি ও পরিচয় ওর দুদিনের। তারপরই প্রায় আধা বেকার, অথবা অনিশ্চিত জীবন। সে জীবনের সঙ্গে এই ঝকমকে মন্দিরাদের কাউকে কল্পনাই করা যায় না। তাহলে নিজে সেধে দুটো জীবনের অশান্তির কারণ হবে কেন।

কথাটা বেশ কিছুদিন হয় ভেবেছে তপন। কিন্তু মন্দিরার উচ্ছলতার সামনে কেমন যেন ভেসে যায় প্রতিবারই। ও কিছু বললে একবারের বেশী দুবার আপত্তি করতে পারে না। ওর ক্ষীণ প্রতিবাদ মন্দিরার উচ্ছ্বাসের তোড়ে খড়কুটোর মত ভেসে যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে এল তপন, মন্দিরার কাছ থেকেও এবার নিজেকে গুটিয়ে আনা প্রয়োজন। নিজের, মন্দিরার—দুজনের স্বার্থেই।

এবং এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পরদিন

ও অফিস কামাই করল। কোত্থেকে একটা পাশ হাতে এসেছিল যেন, মন্দিরা প্রায় জোর করেই রাজী করিয়েছিল তপনকে সন্ধ্যার শোতে সিনেমা যাবার জন্য। নিছক সিনেমাটা এড়ানোর জন্যই অফিস যাওয়া বন্ধ করল তপন।

ইতুর সঙ্গে আড্ডা মারতে আসার দৈনন্দিন কর্মসূচীটা এ কয়দিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল চিনুর। বোধহয় চিনুর দুপুরে পাড়া বেড়ানোটা ভাবী শাশুড়ীর চোখে ভাল নাও লাগতে পারে ভেবেই জেঠিমা এ-কদিন দুপুরে বেরুতে দেননি ওকে। আজ বুড়ী বিদায় হতেই ছুটি পেয়ে চিনু এসে হাজির হল ইতুদের বাড়ি।

তপন পাশ ফিরে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। চিনু স্বপন ভেবে ঘরে ঢুকল।

—স্বপনদা, কবে যাচ্ছ?

তপন ফিরে তাকাল। সামান্য বিব্রত তপনও হয়েছিল, তবু সামলে নিয়ে একটু হেসে বলল, স্বপনের প্রক্সিটা আপাতত আমিই দিচ্ছি। সামনের মাসের ছ'তারিখ।

চিনু এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। একটা বই নাড়তে নাড়তে বলল, দোকানে গেলে না?

—কোন দোকান?—বলেই মনে পড়ল তপনের, বলল, ও বইয়ের দোকানের কথা বলচ। দোকানতো বন্ধ আজ।

একটু অবাক হল চিনু, কিন্তু আমাদের পাশের ঘরের ভদ্রলোকও তো বইয়ের দোকানে কাজ করেন, তিনি তো গেলেন।

তপন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, সব দোকান তো বন্ধ নয়, আমাদের মালিকের স্ত্রী মারা গেছেন বলে আমাদের বন্ধ।

কথাটা অবিশ্বাস করলনা চিনু। কিন্তু তপনের অনেক কথাতেই আজকাল কোথায় যেন ফাঁক থাকে বলে মনে হয়। ঠিক বুঝতে পারেনা চিনু। নিঃশব্দে বইটার পাতা উল্টে চলে ও। তপনও কোন কথা হাতড়ে পায় না। অথচ নৈঃস্তব্ধ্যটা অস্বস্তিকর ঠেকে। চিনু কি কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে? বার দুই তিন চোখ তুলেও

নামিয়ে নিল চিনু। অস্বস্তির সঙ্গে সামান্য ভয় এসে যোগ হল এবার তপনের। চিনু কি বলতে চায়?

—বাড়ীর সব খবর ভাল?—পাশ কাটানর চেষ্টা করে তপন।

আস্তে মাথা নাড়ে চিনু। তারপর আবার একবার জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তপনের দিকে।

আস্তে জিজ্ঞেস করে তপন, কিছু বলবে?

কি যেন বলতে গিয়েও মাথা নাড়ে চিনু, না থাক।

জোর করেই সহজ হবার জন্য হাসল তপন।—তুমি বড় লোক নয় বলেই লজ্জাব ভূষণটি তো তোমার কোনদিন ছিলনা, ওটি আবার সংগ্রহ করলে কোত্থেকে।

কিন্তু এত প্রস্তুতির পরও কিছুতেই চিনু ওর বক্তব্য সাজিয়ে বলতে পারলনা। ঠেকে ঠেকে শুধু বলল, জেঠিমা আমার একটা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।

তপন খুশির অভিনয়ে বলল, তাই নাকি? সুসংবাদ। অনেক-দিন নেমন্তন্ন খাইনা।

মুহূর্তে আহত-অবাক দৃষ্টি তুলে তপনের দিকে তাকাল চিনু। অস্ফুটে বেরিয়ে এল বিস্ময়োক্তি, সুসংবাদ!

চিনুর চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হল তপন। বুঝল, আর অভিনয় করে লাভ নেই। একদিন তো জানাতে হবেই, সত্যি কথাটা আজই না হয় জানুক চিনু।

শান্ত সংযত গলায় বলল তপন, তুমি কি বলতে চাও আমি জানি। কিন্তু একটু অপ্রিয় হলেও একটা সত্যি কথা তোমাকে বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন চিনু। আমার বর্তমান অবস্থায় বিয়ের কথা-টথা ভাবা এখন সম্ভব নয়।

চিনু স্বস্তি পেল প্রসঙ্গটা তপনের তরফ থেকে আসায়। আস্তে বলল, তোমাকে কোন রকম চাপ দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তোমার মতামতটা পেলেই আমি জোর পাই।

সহানুভূতির সঙ্গে বলল তপন, তা হয় না চিনু। তোমাকে সব

কিছু বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু আদৌ কোন দিন এ সম্ভব হবে কিনা তাও জানিনা। এতটা অনিশ্চিতির ওপর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। বরং তুমি বিয়ে করে সুখী হও, সেটাই আমার কাম্য।

চিনু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে চোখ তুলে বলল, এই তোমার শেষ কথা ?

নবম গলায় বলল তপন, আমাকে ভুল বুঝনা চিনু, এ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল চিনু, হৈ হৈ করে এই ঘরের দিকেই জ্যোতিকে আসতে দেখে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় উঠে গিয়ে ঝুলান জামার পকেট থেকে বিড়ি বের করতে লাগল তপন। সশব্দে ঘরে এসে ঢুকল জ্যোতি। সঙ্গে দীপেন।

—বিড়ি-ফিড়ি রেখে দাও তপুদা, এই ছাখ একজন সন্থ এঁয়োতি কে পাকড়ে এনেছি। আজ বাবা মিষ্টি না খেয়ে ছাড়ছিনা।

ঠিক বুঝলনা তপন। বিড়ি নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করলে নাকি দীপেন ?

হতাশ ভাবে বিছানাব ওপব বসে পড়ল জ্যোতি, না, তুমি দিন দিনই কেমন যেন ডাম্ হয়ে যাচ্ছ তপুদা। বিয়েটা জীবনে আজকাল কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব নাকি ? চাকরি পেয়েছে, চাকরি। সবে কাল জয়েন করল। সে হিসেবে আজ বাসি বিয়েব দিন, না রে দীপেন ?

সত্যিই খুশি হল তপন সংবাদটায়, সত্যিই সুসংবাদ। কন্‌গ্র্যাচুলেসন্‌। গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস ?

এতক্ষণ লাজুক লাজুক হাসছিল দীপেন। বলল, না, একটা প্রাইভেট্‌ ফার্ম। ইণ্টারন্যাশানল ট্রেড ব্যুরো। চাকরিটা সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে ইণ্টারভিউটা কেমন যেন ছেলেখেলা ভাবেই দিয়েছিলাম। হবে আশা করিনি।

জ্যোতি গম্ভীর ভাবে বলল, তা স্বামীজিকে একটু বাজিয়ে টাজিয়ে

নিয়েছিস তো? দু দিন পরই আবার ডাইভোর্স করে বসবে না তো?

দীপেন হাসল, মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা। আই-বুড়ো নাম তো ঘুচল। অবশ্য পণ দিতে হয়েছে দু'শ'টি টাকা। মার গলার হারটা বাঁধা পড়ল, কিন্তু উপায় কি?

তপন উৎসাহ দিল, আরে ওটা মাইনে থেকেই ছাড়িয়ে আনতে পারবে। চাকরি পেয়েছ এই বাজারে এই বেশী। আচ্ছা বস আমি স্বপনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিড়িটা ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তপন।

ষোল

নাটকের গতি-প্রকৃতি আদৌ নাটকের চরিত্রের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করেনা। অনেক সময় সচেতন নাট্যকারের ওপরও নয়। জীবনের এলো-মেলো আপাত সঙ্গতিহীন ঘটনাগুলো দেখেই বোধহয় সেকস্‌পিয়র সেই নাট্যকারকে নির্বোধ আখ্যা দিয়েছিলেন। লাইফ্‌ ইজ এ টেল্‌ টোল্ড বাই এ ফুল্‌।

নির্বোধ কিনা জানি না, তবে সেই অদৃশ্য জীবন-নাট্যকার যে অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় সেটা টের পাওয়া গেল দিন কয়েক পরেই। তপন যখন এ নাটকের ছড়িয়ে পড়া ডালপালাগুলো কেটে ছেটে ক্রমে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে একেবারে গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্তে এল, তখন মুচকি হেসে সেই নাট্যকার ওদের নিয়ে একটা নতুন খেলা খেলবার মতলব আঁটছিলেন। একদিন তাই ছোট্ট একটা দৃশ্য-পটের সামনে এনে আলগা ভাবে ছেড়ে দিলেন তিনি নাটকের সব কটি মুখ্য কুশীলবকে। তারপর কৌতুকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে চললেন ওদের কার্যকলাপ।

স্থান বোটানিক্যাল গার্ডেন। দিন পয়লা বৈশাখ।

স্থান ও ক্ষণের মত মানুষের মনগুলো প্রত্যক্ষ বাস্তব নয় বলেই

তার কিছু বিশ্লেষণ সময় বিশেষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ নাটকের প্রধান নায়ক তপন নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেই এসেছিল এখানে। মন্দিরার নাছোড় অনুরোধ এড়াতে গিয়ে একটা সিন্ ক্রিয়েট্ করে ফেলতে হচ্ছে দেখেই শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছিল।

প্রিয়ার আবদার অবশ্য কোনদিনই ফেলতে পারেনা তুষার। তবু এক্ষেত্রে ক্ষীণ একটা আপত্তি জানিয়েছিল। নতুন ব্যবসাটার প্রয়োজনেই কিছুটা আত্মগোপনের দরকার হয়ে পড়েছিল বলে। অবশ্য এ ধারণাও ছিল, ওদের কোম্পানিতে নবনিযুক্ত কর্মচারিদের কারোরই আমোদ করতে আসার মত মেজাজ বা সঙ্গতি না থাকারই সম্ভাবনা।

সুজাতা এসেছিল কিছুটা জেদের ঝোঁকে। প্রিয়া আর তুষারের প্রোগ্রামটা টের পেয়েছিল ও। এবং মনে মনে ভীষণ চটে গিয়েছিল ওকে বাদ দিয়ে ওদের প্রোগ্রাম করায়। অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার অনুরোধ করতে পারত। ভদ্রতার খাতিরেই নিশ্চয় রাজী হতনা সুজাতা। প্রচণ্ড অভিমান থেকেই সিদ্ধান্তে এল ও, প্রিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে যে ওরা বাদ দিলেও সে যেতে পারে। এবং প্রিয়ার ঈর্ষা করার মতই একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

প্রিয়াকে কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে সরাসবি প্রশ্ন করেছিল সুজাতা, আপনাকে এ টা অনুরোধ করব মাষ্টার মশায়। কিন্তু কথা দিতে হবে, রাখবেন।

একটু হেসেছিল জ্যোতি, সেটা শক্তির ওপর নির্ভর করে। এটা রামায়ণের যুগ নয় যে, রামচন্দ্র বিশল্যকরণী আনার অনুরোধ করা মাত্র হনুমান গন্ধমাদন পর্বত এনে হজির করবে। আমাদের আনুমানিক শক্তিটা হনুমানিক নয় সেটা স্মরণ রেখে অনুরোধ করতে পার।

সুজাতাও একটু হেসেছিল, অতটা কঠিন অনুরোধ নয়। রাখাটা শক্তির ওপর নির্ভর করছেনা, ইচ্ছের ওপর।

—আচ্ছা, অনুরোধটা শুনি তাহলে।

—পয়লা বৈশাখ আমার সঙ্গে এক জায়গায় একটু চলুন না?

বরাবর ছোট মামার সঙ্গে বেড়াই, কিন্তু ও এবার একটা কাজে আটকে গেছে।

দুশ্চিন্তা জিনিষটা বরাবরই একটু কম জ্যোতির। প্রথম থেকেই বেশ একটা খেলার মৌজ পাচ্ছিল ও। একটু ভেবে দেখল, সবার ক্ষেত্রেই যখন খেলা, এবং খেলাটা যখন প্রায় ভাঙ্গার মুখে, তখন একদিনের জন্য ছোট্ট একটা খেলা-ভাঙ্গার-খেলা খেললেই বা আপত্তি কি? সুজাতার সামান্য জোরাজুরিতেই শেষ পর্যন্ত তাই রাজী হয়ে গেল জ্যোতি।

লক্ষ্য স্থির না থাকলেই আমরা জীবনে উপলক্ষ চাই। নিজেদের মাতিয়ে রাখার। ভুলিয়ে রাখার। সেটা ইংরাজী ক্যালেণ্ডারের বড় দিনই হোক বা বাংলা ক্যালেণ্ডারের প্রথম দিনই হোক। দেশী পাল-পার্বণ হোক অথবা বিদেশী উৎসবের দিন হোক। উৎসবে মাতার দিক দিয়ে বর্তমান বাঙ্গালীবা ভয়ানক উদার, আন্তরিক, আন্তর্জাতিক। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভীড় তাই সব পর্বেই সমান।

এসে অস্বস্তি লাগছিল তপনের। এক তরফা মন্দিরাই বলে যাচ্ছিল, তপনের শ্রোতার ভূমিকা। অবশ্য ইট-কাঠ নয় বলেই সামান্য মাদকতাও যে অনুভব না করছিল তা নয়। মন্দিরার সামনে বিড়ি খেতে একটু কুণ্ঠা বোধ করছিল বলে একবার উঠতে হল তপনের। বলল, একটু বসুন, সিগারেট নিয়ে আসি।

অন্যমনস্কেই হাঁটছিল তপন, হঠাৎ সামনে জ্যোতিকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। থতমত খেয়ে গেল জ্যোতিও।

—কিরে তুই এখানে?

একটু হাসল জ্যোতি, বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে আসতে হল। তুমি?

—আমিও। ক্যাপ্পুরা এমন ভাবে ধরল। আচ্ছা, যা।

ছাড়া পেয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল জ্যোতি। সুজাতা ফ্লাস্ক-এ চা এনেছিল, কেক্ কিনতে বাইরে গিয়েছিল জ্যোতি। মনে

মনে এই প্রথম ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল ও। ভাগ্যি সুজাতার সঙ্গে দেখে ফেলেনি। তাহলে নিশ্চয়ই ভাবত প্রেম করে বেড়াচ্ছি।

আর একটি ঝোপের আড়ালে তখন পাশে ট্রান্‌জিস্‌টার খুলে রেখে এবং সেদিকে কান না রেখে কথায় মশগুল হয়ে বসেছিল তুষার ও প্রিয়া। কি একটা কথার পিঠে যেন প্রিয়া কপট রাগে বলল, এই সাধারণ কথাটা বোঝনা কেন?

ভুরু তুলে জবাব দিল তুষার, ফরাসী রসবোধ সবার ভেতর আশা কর কেন?

তুষারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল প্রিয়া, তোমরা ভীষণ হিংসুক!

তুষার কি একটা জবাব দিতে গিয়েও হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, আরে, তোমাদের সেই ফরাসী মাষ্টার না?

প্রিয়া তুষারের গা ঘেষে এল, কোথায়?

—ঐতো, এদিকেই আসছে।

প্রিয়া তাড়াতাড়ি ট্র্যান্‌জিস্‌টার বন্ধ করে দিল। ঝোপের কোণ ঘেঁষে বসল। তারপর জ্যোতি ওদের পেরিয়ে গেলে বলল, চল বাবা, কেটে পড়া যাক। হঠাৎ দেখে ফেললে ঠিক সুজাতার কানে উঠবে। পিছে লেগে অস্থির ক ব তুলবে তা হলে।

আসলে সুজাতার চেয়েও ও বেশী ভয় পাচ্ছিল মাষ্টর মশায়কেই। মাষ্টব মশায় ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলুক এটা চাচ্ছিলনা ও। অবশ্য মেয়েদের মনের সত্যি রং স্বয়ং ভগবানও জানেন না বলেই তুষারের চোখে এ রংটা ধরা পড়লনা। ও ভাবল সুজাতার ভয়েই পালাতে চাচ্ছে প্রিয়া। অবশ্য এ রকম প্রকাশ্য উৎসব-প্রাঙ্গন থেকে নিজের প্রয়োজনেই আড়ালে থাকতে চাচ্ছিল তুষারও। তাই আপত্তি করল না। বলল, সেই ভাল, চল। বরং নিরিবিলি কোথাও যাওয়া যাক।

ফিরে এসে অন্যমনস্ক বসে ছিল তপন। মন্দিরার একটা কথাও

কানে যাচ্ছিলনা ওর। জ্যোতিটা কার কার সঙ্গে এসেছে কে জানে। কোন দিকে আছে তাও ঠিক জানা নেই। হঠাৎ দেখে ফেললে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থির হতে হবে।

হঠাৎ মন্দিরা সামনের দিকে তাকিয়ে তপনের হাতে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, এই, আপনার উপছাত্রীটি না?

অবাক হল তপন, উপছাত্রী?

—আরে, প্রিয়া। ঐ তো।

সামলে নিল তপন, ও প্রিয়া!—তারপর মন্দিরার আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকাল। সঞ্চারমান প্রতিটি মেয়ের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু সঠিক প্রিয়াটিকে খুঁজে পেলনা। পাবার কথাও নয়। তবু বিস্মিত হয়ে প্রায় চোখ বুজেই ওর বলতে হল, তাইতো, প্রিয়াই তো দেখছি।

মন্দিরা রাগে ফেটে পড়ল, আর দিন পেল না, ঠিক আজই এসে হাজির। যা মেয়ে একখানা, দেখলে ঠিক বাড়ী গিয়ে রটিয়ে দেবে। তা ছাড়া সুজাতার কানে গেলে সাহেবের কানে উঠতেও দেরী হবে না।

এত দূর তপনও ভেবে দেখেনি। এবার ভেবে ভয় পেল। বলল, কি করা যায় বলুন তো?

মন্দিরা উঠে দাঁড়াল, বেড়ান মাথায় থাক বাবা, চলুন কেটে পড়ি।

তপনও উঠে দাঁড়াল, সেই ভাল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বরং আর একদিন আসা যাবে'খন।

কিন্তু দু পা এগিয়েই আবার থামল তপন। বলল, ওরা কোন দিক দিয়ে কোথায় যাবে কে জানে। তা ছাড়া আপনাকে বলিনি এতক্ষণ, আমার একটি ভাইও এসেছে দেখলাম। এক সঙ্গে না যাওয়াই বোধহয় ভাল। আপনি এ দিক দিয়েই যান, আমি অন্য দিক দিয়ে পরে চলে যাচ্ছি।

আত্মরক্ষায় উদ্বিগ্ন মন্দিরা আপত্তি করলনা।

স্বস্থানে ফিরে এসে জ্যোতিও উসখুস করছিল। তপুদার সঙ্গে

আর কে কে এসেছে কে জানে। যদি পাড়ার চেনা কেউ এসে থাকে তাদের চোখে পড়লে লজ্জায় পড়তে হবে।

সুজাতারও নজরে পড়েছিল ওর এ হঠাৎ পরিবর্তন। কেক্ কিনে যেন অন্য লোক হয়ে ফিরেছেন মাষ্টার মশায়। খুশির মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেল সুজাতার। একটু বিরক্তই হল এতে দাদুর আদুরে নাতনীটি। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল ও, অমন উসখুস করছেন কেন?

মুখ কালো করে বলল জ্যোতি, সেই ফিট্‌টা আসার আগে শরীরটা যেমন লাগে না, ঠিক সেই রকম লাগছে যেন।

আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুজাতার, ওমা, কি হবে তাহলে? আমি একা মেয়ে মানুষ—।

এক টোকায় স্বাধীন জেনানার খোলস ছেড়ে আসল অবলা চেহারাটি বেরিয়ে আসতে দেখে হাসি পেল জ্যোতির।

গম্ভীর হয়েই ওকে অভয় দিল জ্যোতি, ভয় নেই, ফিটে পড়ার ঘণ্টা চার পাঁচ আগে থেকেই আমি বুঝতে পারি। চল, তার মধ্যে বাড়ী পৌঁছে যাওয়া যাবে।

কৌতুকপ্রিয় সেই অদৃশ্য জীবন নাট্যের নাট্যকার শেষ কৌতুকটুকু উপভোগ করবার জন্যই যেন একই সময়ে গেটের মুখে পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন জ্যোতি, সুজাতা ও মন্দিরাকে।

এবং বাস এলে একই বাসে ঠেলে তুললেন ওদের। কিন্তু ঘটনা-চক্রে কেউ কাউকে চিনল না।

ওদিকে তখন রেষ্ট হাউসের সামনে দিয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে এগিয়ে আসছিল তপন, তুষার ও প্রিয়া। একই নাটকের চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও ওরাও পরস্পর পরস্পরকে চিনলনা।

বিপদটা অল্পের ওপর দিয়ে কেটে যাওয়ায় মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল তপন। কিন্তু তখনকার মত আশু বিপদটা কাটলেও এই ঘটনার রেশ টেনে আর এক নতুন বিপদে পড়তে হল পর দিন অফিসে।

সাহেবের আগের দিন কয়েকটা ফাইলে সই করতে বাকী ছিল। সেগুলো নিয়ে আসতে খবর পাঠালেন তপনকে। তপন কাগজ পত্র নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। ফাইলটা টেনে নিয়ে সাহেব বললেন, বসুন।

তপন বসল।

সইগুলো শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু হেসে বললেন মিঃ রাহা, আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে স্বপনবাবু।

তপন টের পেল, হাসিটা ভদ্রতা রক্ষার হাসি। একটু অবাক হয়ে বলল, আমার বিরুদ্ধে!

মিঃ রাহা বললেন, হ্যাঁ, কাল ট্যাক্সি ভাড়াটা কে দিয়েছিল?

তপন আরো অবাক হল, ট্যাক্সি ভাড়া! কিসের ট্যাক্সি?

—আমি শুনেছি সব, সামান্য গম্ভীর হয়ে বললেন মিঃ রাহা, আমি অবশ্য ওকে বকে দিয়েছি আপনাকে ওভাবে উত্যক্ত করার জন্য।

আলোচনার যোগসূত্র হাতড়ে পেলনা তপন। তবু আন্দাজেই সামলে নেবার চেষ্টায় বলল, না না, উত্যক্তর কি আছে? আর ভাড়াই বা কি এমন একটা।

মিঃ রাহা বাধা দিলেন, খুব কমও নয়; ভাড়াটা আপনার নিতে হবে কিন্তু। কত হয়েছিল বলুন।

আবার বিপদে পড়ে তপন। কোত্থেকে কতদূর কিছুই জানেনা। কি বাবদে এল গেল, তাও নয়। সঠিক ভাড়া কি করে হিসেব করবে? যতদূর মনে হচ্ছে মন্দিরার সঙ্গে ওর যাওয়াটা টের পেয়েছেন। কিন্তু সে ভাড়ার কথাও তো ঠিক বলছেন না! তবু কিছু একটা বলতে হয় বলে বলে ফেলল, দেখুন ও দু-এক টাকার ব্যাপার। ওজন্য আপনি—

মিঃ রাহা ওর কথার ওপরই আশ্চর্য হয়ে বললেন, দু-এক টাকা মানে? শ্যামবাজার থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন—।

বিস্মিত তপনের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, ওরে বাবা, সেতো অনেক ভাড়া—।

মিঃ রাহার প্রথম থেকেই কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছিল ওর কথাগুলো। সোজা হয়ে বসে বললেন, তা আপনি কি ভেবেছিলেন?

তপন ততক্ষণে সামলে নিয়েছে বলল, হ্যাঁ, তাই বলছিলাম যে সেতো অনেক ভাড়া। কিন্তু কপালগুণে আমার এক বাল্যবন্ধুর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিলুম। তাই শুধু পেট্রোল খরচটাই দিতে হয়েছিল। অবশ্য মন্দিরা দেবী জানেন না তা।

সন্দেহে ভুরু কুঁচকে উঠল এবার মিঃ রাহার, মন্দিরা দেবী! মন্দিরা দেবী কি জানবেন?

—কেন, ভাড়া?

বিস্ময়ে সামনে ঝুঁকে পড়লেন মিঃ রাহা, গেলেন সুজাতার সঙ্গে আর মন্দিরা জানবে ভাড়ার কথা? কি বলছেন আপনি?

সুজাতা! হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মাথার ভেতর। মুহূর্তে এতক্ষণের এলোমেলো আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুটিকে চিনতে পারে তপন। কিন্তু ততক্ষণে চোরা স্রোতের টানে অনেক দূর সরে গিয়েছে ও। প্রায় অকূলে গিয়ে পৌঁছেছে। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ খড়কুটোটুকু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল ও। সামান্য আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, ও, সুজাতা বলেনি বোধহয় আপনাকে যে, ফেরার সময় হঠাৎ মন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ওকেও একটা লিফট দিয়েছিলাম। আমার টাকার চেঞ্জ না থাকায় টাকাটা তখনকার মত মন্দিরা দেবীর কাছ থেকেই নিতে হয়েছিল। ওকে অবশ্য, এখনও বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি হিসেবটা।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। মিঃ রাহা স্বস্তি বোধ করলেন এবার। সহজ ভাবে বললেন, কিন্তু আসলে ওটা দেয় সুজাতার। ওইতো আপনাকে আবদার করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল শুনলাম।

তপন হাত জোড় করল, ওটার জন্য আর আপনি পীড়াপীড়ি করবেন না স্যার। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হতে দিন।

মিঃ রাহা এদিক দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ী। একবারেই তপনের অনুরোধটি মেনে নিলেন। বললেন, আচ্ছা থাক তবে। কিন্তু দেখবেন খুব বেশী

প্রশ্রয় দেবেন না ওকে। পেয়ে বসবে তাহলে।—তারপর একটু ভেবে বললেন, তাছাড়া, ওর দাদুও হয়তো এসব অপছন্দ করতে পারেন।

এতক্ষণে ওকে ডাকার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারল তপন। অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল কান দুটো। যেন ড্রাইভারকে শাসন করছেন। এতই যদি আপত্তি তবে জেনে শুনে মেয়েকে পড়াতে একটা পূর্ণ বয়সের যুবককে কেন পাঠালেন। জানে তপন, কোন আপত্তিই উঠত না, তপন যদি এখানে কেরাণী না হয়ে, ছেলে হিসেবে যত ফাঁপাই হোক, তুষারের কোন গাড়ীওয়ালা বন্ধু হত।

মিঃ রাহাকে প্রথম দিনের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই বিনয়ের সঙ্গে বলল তপন, আমার কাছে ছোটবোনের মত স্নেহ পায় বলেই বোধহয় আবদারের সাহস পায়। তবু এবার থেকে একটু কড়া হব না হয়।

মিঃ রাহা একটু বিব্রত হলেন। বললেন, না না, ওর দাদুও অবশ্য খুবই লিবারেল্। তবু বুড়ো মানুষ তো। যাকগে, আপনার শরীর-টরীর কেমন আছে বলুন! আর কোন ট্রাবল্স নেই তো।

তপন মুখ কালো করে বলল, সেকথাও আপনাকে আজ বলব ভেবেছিলাম। পরশু আবার হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে কম্প্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন। ক'দিনের ছুটি পেলে—।

মিঃ রাহা আঁতকে উঠলেন, এখন ছুটি? অসম্ভব। জনা চার পাঁচ একসঙ্গে মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে ডুব দিয়ে বসে আছে। তারা জয়েন্ করুক। বরং বড় বাবুকে বলে আপনার কাজের চাপ কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছি।

অবশ্য এ অজুহাতটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মিঃ রাহার আপত্তির আর একটা সূক্ষ্ম কারণও যে আছে তা জানত তপন। কলকাতার বাইরে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির পদটি অলঙ্কৃত করার জন্য যাতে অনুরুদ্ধ হন:তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি। মনে হচ্ছে দু-চার দিনের ভেতর সে অনুরোধটা এসে যাবে। কাজেই এ

সম্ভাবনার মুখে ভাষণ না লিখিয়ে নিয়ে যে ওকে ছাড়বেন না সাহেব, তা জানত ও।

বোধহয় ওর অনুপস্থিতির ভয়ে সাহেব আরো কিছুটা উদার হলেন। —আপনি কিছুদিনের জন্য বরং সুজাতাকে পড়ানোটা বন্ধ রাখুন। অফিস থেকেও যাতে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারেন সে ব্যবস্থাও করে দেব।

সুজাতার প্রসঙ্গে আপত্তি জানাল তপন, না না, ও খাটনিটুকুর জন্য ভাববেন না আপনি। সুজাতার ভীষণ ক্ষতি হবে তাতে।

সস্নেহ ভৎ‍র্সনা করলেন মিঃ রাহা, কিন্তু ওর চেয়েও আপনার ক্ষতির সম্ভাবনাটা আরো বেশী। আপনি দেখছি আমার মতই, পড়াশুনার ব্যাপারে রোগ-শোকেরও হিসেব থাকে না।

মিঃ রাহার হাতের পাশের র‍্যাকের ওপরে 'লাইফ্', 'উওমেনস্ ওনলি' ও 'ফিল্ম ফেয়ারের' স্তূপের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে নিয়ে সলজ্জ ভাবে হেসে বলল তপন, তা যা বলেছেন।

মিঃ রাহার সব প্রস্তাবগুলোই অবলীলাক্রমে গৃহীত হওয়ায় খুব খুশি হলেন তিনি। এবং খুশির প্রাবল্যে তখনই ফোন তুলে নিলেন, দাঁড়ান, সুজাতাকে জানিয়ে দিই যে শরীর খারাপ বলে কিছুদিন যেতে পারবেন না আপনি। আপনাকে চিনি তো, সামনে পেয়ে ছাত্রী ধরে বসলে আপনি কিছুতেই লজ্জায় না বলতে পারবেন না।

মিঃ রাহা ফোনে বেশ রঙ-চঙ দিয়ে স্বপনবাবুর কথাটা জানিয়ে দিলেন মেয়েকে। এবং এও জানালেন যে, শরীর ভাল হলে স্বপনবাবু নিজেই যাবেন আবার।

তপন এতবড় একটা সমস্যা থেকে এত সহজে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক, বেশ কিছুটা জাল নিঃশব্দে গুটিয়ে ফেলা গেল তাহলে।

ফোনে স্বপনবাবুর অসুখের এবং হঠাৎ ডুব দেবার সংবাদটা পাওয়ার পর থেকেই মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল সুজাতা। সত্যিই অসুস্থ তো ? না, বাবা বেড়াতে যাবার জন্য কিছু বলেছেন ? গজো ব্যাটা যে সেদিন হাতীবাগানে বাজার করতে যাবে, ওদের এক ট্যাক্সিতে দেখবে এবং বাবা বিকেলে নববর্ষের প্রণাম করতে এলে বুদ্ধিমানের মত গল্পে গল্পে সে কথা বাবাকে বলবে ভাবতেই পারেনি সুজাতা। বাধ্য হয়ে বাবার কাছে সব স্বীকার করেছিল সে। অবশ্য দোষটা নিজের ঘাড়েই নিয়েছিল। বলেছিল, আমিই আবদার করায় মাষ্টার মশায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হয়েছিলেন। বাবা কিছু বলার আগেই দাদু চলে আসায় প্রসঙ্গটা আর এগোয়নি সেদিন। বাবার প্রতিক্রিয়াও ঠিক জানতে পারেনি তাই। কিন্তু এখন সন্দেহ হতে লাগল, বাবা কিছু বলেননি তো স্বপনবাবুকে ?

দিন কয়েক ভেবে শেষ পর্যন্ত প্রিয়াকে ভার দিল সুজাতা, যেমন করে হোক মন্দিরা মিত্রর কাছ থেকে স্বপনবাবুর ঠিকানাটা যোগাড় করে আনতে। প্রিয়ার মত তুখোড় মেয়ের পক্ষে এটা কোন সমস্যাই নয়। পরদিনই ঠিকানা নিয়ে এল প্রিয়া।

এবং তারপরের দিন সকালের দিকে সুজাতা সরাসরি ট্যাক্সি করে চলে এল সেই ঠিকানায়।

স্বপন, জ্যোতি আর দীপেন বসে কথা বলছিল ঘরে। সবারই মুখ থমথমে। বিমর্ষ। দীপেনের মুখে যেন এক পোঁচ কালি মেখে দিয়েছে কেউ। বিপর্যয়ের ছাপ গোটা চেহারায়। দীপেন চাকরী পাওয়ার পরদিনই জ্যোতি এ ঘরে বসেই ঠাট্টা করে বলেছিল, স্বামীটিকে একটু বাজিয়ে টাজিয়ে নিয়েছিস তো ? ছদিন পরেই আবার ডাইভোর্স করে বসবে না তো ? সেই ঠাট্টা যে এত তাড়াতাড়ি এমন

নির্মম ভাবে সত্যে পরিণত হবে কেউ ভাবতে পারেনি সেদিন। জয়েন্ করবার দিনই অফিসে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল দীপেনরা, অফিসে বিরাট একটা তালা ঝুলছে। মালিকদের পাত্তা নেই।

জ্যোতি সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, পুলিশে খবর দিয়েছিস তো?

—দিয়েছিলাম। পুলিশ আমাদেরই নিন্দে করল চাকরির নামে মেতে গিয়ে কাঁচা কাজ করেছি বলে।

জ্যোতি একটু শ্লেষ দিয়ে বলল, কিন্তু পাকা খাতায় কেস্‌টা লিখে নিয়েছিল তো?

—তা নিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে কোন পাকা কথা দেয়নি। একটু থেমে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল দীপেন, দুশোটা টাকাই বড় কথা নয়, প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অপমান বোধ করছি এভাবে প্রতারিত হবার জন্য।

আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল দীপেন, থেমে গেল দরজার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামায়। স্বপন ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে একটি রং করা তরুণী-মুখ বেরিয়ে এল ওকে দেখে।

—স্বপন গুপ্ত এ বাড়ীতে থাকেন?

স্বপন বিস্মিত হল। জীবনে কোনদিন মেয়েটিকে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। বলল, হ্যাঁ, আমি—।

পায়ে আচমকা একটা চাপ পড়ায় থতমত খেয়ে থেমে ফিরে তাকাল স্বপন। জ্যোতি চোখের ইশারা করে ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল। এবং ট্যাক্সির সামনে এসে অবাক হয়ে বলল, আরে, তুমি? কি খবর? চল, আমিও বেরুচ্ছিলাম।

সুজাতাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ট্যাক্সিতে উঠে বসল জ্যোতি। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, সোজা চলিয়ে

হতবাক স্বপন ও দীপেনের নাকের সামনে দিয়ে ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ট্যাক্সিটা গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যোতি। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় যাবে? আমার কিন্তু একটু এগিয়েই নামতে হবে।

জ্যোতির সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে বলল সুজাতা, আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না আপনার এরকম একটা অসুখ।

জ্যোতি একটু হেসে বলল, এ অসুখের মজাই এই।

—আজ অফিস যাবেন না?

—না, শরীরটা ভাল নেই বলে আর গেলাম না। তা তুমি হঠাৎ সশরীরে এসে হাজির, কি খবর?

সুজাতা গম্ভীর ভাবে বলল, খবর দিতে নয়, নিতে এসেছিলাম। এখন শরীর কেমন আছে।

—খুব ভাল নেই।

সুজাতা এবার জ্যোতির চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবেন?

সত্যি জবাবের কথা উঠলেই আজকাল ভয় হয় জ্যোতির। তবু বলল, কেন দেব না?

—বাবা আপনাকে কিছু বলেছেন সেদিনের ব্যাপারে?

বলেছেন কিনা জ্যোতিও জানেনা, তবু হো হো করে হেসে উঠল—তাই বল, এ জন্যেই এসেছিলে। তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার। সেরকম কিছু বলেন নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুজাতা, যাক শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। সেদিন থেকে ভীষণ অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলাম।

গন্তব্যস্থানহীন জ্যোতি জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা মনগড়া গন্তব্যস্থান লক্ষ্য করে বলল, এসে গেছি। আজ চলি তাহলে।

আব্দারের সুরে বলল সুজাতা, যেতে পারেন, কিন্তু একটা কথা দিয়ে।

—কি?

—আজ তো আফিসে যাচ্ছেন না, এবং বেশ কিছু দিনের জন্য

আমাদের পড়াতেও আসছেন না। কিন্তু আজ দুপুরে কয়েক মিনিটের জন্য একটু আমাদের বাড়ী আসতে হবে। না বললে শুনব না কিন্তু।

মনে মনে ভেবে দেখল জ্যোতি, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা বৃথা। একবার যখন বাড়ী চিনেছে, না গেলে সরাসরি এসে বাড়ী চড়াও করবে হয়তো। ভরা ডুবির আশু সম্ভবনা তাতে। তারচেয়ে বরং দুপুরে মিনিট কয়েকের জন্য ম্যানেজ করে আসাই শ্রেয়। তবু জিজ্ঞেস করল, কেন বল তো ?

বংকরা ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সুজাতা, ভয় নেই, গুম করে ফেলবনা।

জ্যোতি বাধ্য হয়ে মত দিল।—আচ্ছা যাব। জেরা বাঁয়া রোখকে ড্রাইভার সাব।

ট্যাক্সী ফুটপাথ্ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোমানীর ভোতা চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে এত দিন,অন্তত বর্ত-মান ব্যবসাটার ক্ষেত্রে, নিজেকে:খোদা ভেবে বেশ আত্মতৃপ্তিতে মৌজ হয়ে ছিল তুষার। কিন্তু সেই ভোতা মুখের মালিক যে খোদার উপর খোদকারি করার এত বড় শক্তির অধিকারী, এতদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি তা। কিন্তু ব্যবসার দরজায় তালা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোমানী এমন চাল চালল যে রীতিমত আশঙ্কা হল তুষারের, লভ্যাংশ থেকে একেবারে ফাঁকি না পড়তে হয়। আজ সকালেই সোমানী এসেছিল। ওর সঙ্গে গোপন আলোচনার পর থেকেই আশঙ্কাটা আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তুষারের। তার ওপর আবার যাবার সময় সংবাদ দিয়ে গেল সোমানী, নব নিযুক্ত কর্মচারীদের দুএকজনকে আসার সময় এ গলিতে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে নাকি। কথাটা সত্যি কিনা জানেনা তুষার। সত্যি হলে তার ফলাফলটাও সঠিক জানেনা। এতে আশঙ্কাটা আতঙ্কে পৌঁছাল তুষারের।

বিপদে পড়লে কোনদিনই ও নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেনা। এদিক দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ী ও। অথচ কথাটা বাবাকে বলতেও ভয়

পেল। বাধ্য হয়ে অগতির গতি জামাইবাবুকে স্মরণ করতে হল ওর। বাবা খেয়ে দেয়ে ওপরে শুতে যেতেই জামাইবাবুকে ফোন করল, যেমন করেই হোক, আজই একবার আসা দরকার আপনার। ভীষণ বিপদে পড়েছি।

তুষার ফোন ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দরজার সামনে জ্যোতিকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল সেটা। হেসে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এ সময়ে?

জ্যোতিও একটু হাসল।—আর বলেন কেন, ছাত্রীদের তলবে।

সুজাতা দূর থেকে ওদের দেখে এগিয়ে এল।—যাক, এসেছেন তাহলে।

তুষার শ্লেষের সুরে বলল,তবে যে শুনলাম বনের মোষ তাড়ানোর কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন নাকি।

বহুদিন পর একটা যুৎসই রসিকতা করতে পারায় তৃপ্ত হল তুষার।

জ্যোতি কপট বিনয়ে বলল, যারা ঘরের খায় এ অপবাদটা তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের ঘরে খাওয়া বাড়ন্ত।

সুজাতা চাপতে গিয়েও হেসে ফেলল। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তুষারের। ভুরু কুঁচকে বলল, আচ্ছা স্বপনবাবু, বাঁকা কথা বলাটা কি আপনার অভ্যেস, না আমার ক্ষেত্রেই শুধু প্রয়োগ করেন?

সামান্য লজ্জিত হল জ্যোতি। হাতজোড় করে বলল, ক্ষমা করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে করতে এখন আর ক্ষেত্র বিশেষ নেই, বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।

সুজাতা দুষ্ট হাসি হেসে হাত তুলে বলল, ব্যস, আজ এই পর্যন্তই থাক। এবার ওপরে চলুন।

তুষারের কাছে বিদায় নিয়ে সুজাতাকে অনুসরণ করল জ্যোতি। এবং দোতালায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ দুপুরে তলবের কারণটা কি?

সুজাতা একটু হেসে বলল, আপনি আমাদের জন্য অনেক

খেটেছেন। তাই আমি আর প্রিয়া আজ আপনাকে একটু এন্টার-টেইন্ করব ঠিক করেছি।

জ্যোতি সঙ্কুচিত হল, ছি ছি, তোমরা আবার এসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন বল তো?

জ্যোতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সুজাতা, হাঙ্গামার কি আছে। সিনেমা আর রেস্টুরেন্ট, দুটো ব্যবস্থাই বাইরে। বাড়ীর প্রোগ্রাম নিছক কয়েকটি কাটলেট্। নিজের হাতে তৈরী করেছি।

হঠাৎ মনশ্চক্ষে দেখতে পেল যেন জ্যোতি, ওর নিজের হাতে তৈরী কাটলেট্ বিরাট কোন রেস্টুরেন্ট থেকে পরের হাতে বাহিত হয়ে সন্তর্পণে রান্নাঘরে এসে ঢুকছে। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, খুবই অন্যায় করেছ। আগে জানলে আমি মত দিতাম না।

উত্তরে সুডৌল কব্জিটা উল্টে ঘড়ি দেখল সুজাতা।—নাঃ, প্রিয়াটা এখনও আসছে না কেন বলুন তো!

ফোনে তুষারের গলা শুনেই মিঃ রাহা বুঝেছিলেন বেশ কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে শালা। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, অফিসের পর স্ত্রীর পাহারা এড়িয়ে ওবাড়ী যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই টিফিনের ফাঁকে ট্যাক্সি করে এসে হাজির হলেন তিনি। আসার আগে হেড্ক্লার্ককে বলে এলেন বাড়ী থেকে ফোন এলে অফিসের জরুরী কাজে একটু বাইরে গেছেন বলে দিতে।

জামাইবাবুকে অবশ্য এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি তুষার। দেখে খুশি ও অবাক হল।—আরে, এর ভেতরই চলে এসেছেন?

মিঃ রাহা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, শালার যা জরুরী তলব! তারপর, কতদূর কি বাধিয়ে বসে আছ শুনি।

তুষার বলল, সে অনেক কথা, বসুন, বলছি। আগে একটু কফির ব্যবস্থা করি।

—কোন দরকার নেই, টিফিন করেই বেরিয়েছি। তুমি সুস্থির

হয়ে বসতো।—চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা চুরুট ধরালেন মিঃ রাহা। —সুজাতা কোথায়? পড়ে,পড়ে ঘুমোচ্ছে বোধহয়?

—না, পড়ছে বোধহয়। স্বপনবাবু আজ দুপুরে এসেছেন দেখছি।

কৌতুকে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ রাহা।—ভায়া কি আজকাল দুপুরেই দ্রব্য বিশেষ গিলছ নাকি?

তুষার অবাক হল, তার মানে?

—জলজ্যান্ত লোকটাকে দেখে এলাম অফিসে কাজ করছে আর তুমি বলছ সে পড়াতে এসেছে।

ঝিলিক মারা চোখে হাসল তুষার।—দ্রব্য বিশেষের সন্দেহটা কিন্তু এবার আপনার ক্ষেত্রেই তুলতে হচ্ছে। জলজ্যান্ত স্বপনবাবুটি এই মাত্র আমার সঙ্গে কথা বলে ওপরে ওঠে গেলেন, আর আপনি বলছেন ···।

—অসম্ভব।—মিঃ রাহা জোর দিয়ে অস্বীকার করলেন, আমি বেট্ রেখে বলতে পারি।

দুষ্টুমির হাসি ফুটল তুষারের মুখে।—বাট্ মাইণ্ড ইট্ জামাইবাবু, নির্ঘাত হেরে যাবেন কিন্তু।

আজকের পার্টির তৃতীয় পাত্রী প্রিয়া জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে এ আলোচনার কিছুটা শুনে গেল। এবং ওপরে গিয়ে ওদের শোনাল।

—নিচে দুই শালা-ভগ্নিপতি মাষ্টার মশায় সম্বন্ধে কি যেন বেট্ ধরছে শুনলাম।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল জ্যোতি।—ভগ্নিপতি!

সুজাতাও অবাক হল।—বাবা এসেছেন? হঠাৎ এসময়ে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আতঙ্কের সঙ্গে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল জ্যোতি। তারপর কোন উপায় নেই দেখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল সুজাতার কাছে।

—তোমার কাছে জীবনে এই প্রথম একটা অনুরোধ করছি সুজাতা। ঠিক ঐই মুহূর্তে এখানে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়াটা

আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। এর সঙ্গে অফিসের একটা গোলমাল জড়িয়ে আছে। পরে তোমাকে সব বলব। কিন্তু এখনকার মত আমাকে যেমন করে হোক একটু বেরিয়ে যেতে সাহায্য কর।

মাষ্টার মশায়ের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা দুজনেই ভয় পেয়ে গেল। বুঝল, সত্যিই বড় রকমের কোন বিপদ না ঘটলে এভাবে বলতেন না মাষ্টার মশায়। নিচে নামবার অন্য একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দেবার জন্য প্রিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গেল জ্যোতিকে। এদিক সামলানোর জন্য ঘরেই থেকে গেল সুজাতা।

একটু বাদেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিঃ রাহা ও তুষার। তুষার ঘরে ঢুকেই কিছুটা বোকা বনে গেল। জিজ্ঞেস করল, স্বপন-বাবু কইরে?

একটু অবাক হবার ভান করল সুজাতা, এই মাত্র তো বেরিয়ে গেলেন। কেন, দেখা হয়নি তোমাদের সঙ্গে নিচে?

মিঃ রাহা ও তুষারের চোখাচোখি হল একবার। মিঃ রাহা চিন্তিত হলেন। কেমন যেন হেঁয়ালী মনে হল ব্যাপারটা। তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। চল তো, অফিসে একটা ফোন করে দেখি।

নতুন এক রোমাঞ্চের গন্ধে ততক্ষণে মেতে উঠেছে তুষার। সোৎসাহে লাফিয়ে উঠল. তাই ভাল, চলুন।

সুজাতা একবার ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বাবা?

কিন্তু সে কথার কোন জবাব না দিয়েই উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে গেলেন ওঁরা।

ও বাড়ী থেকে বেরিয়েই টানা তপনের অফিসে চলে এল জ্যোতি। এই মুহূর্তে দাদাকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন। বারে বারে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। আমার অসাবধানতার জন্যই হল এটা। মনে মনে প্রার্থনা জানাতে লাগল, ভগবান, তপুদার যেন কোন সর্বনাশ না হয়।

কিন্তু প্রার্থনাটা ভগবানের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওর পিছে এসে পৌঁছে গেলেন মিঃ রাহা ও তুষার। অফিসে ঢুকতে যাচ্ছিল জ্যোতি, হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল ঘাড়ে হাত পড়ায়। তুষার!

তুষারের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি চিকচিক করছে।—কি খবর স্বপনবাবু, হঠাৎ পালিয়ে এলেন যে?

কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জ্যোতির দিকে তাকিয়ে থাকলেন মিঃ রাহা। তারপর অস্ফুটে বললেন, কে স্বপনবাবু?

তুষার উৎসাহের সঙ্গে বলল, কেন? এইতো স্বপনবাবু। সুজাতার মাষ্টার!

মিঃ রাহার চোয়ালের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। চেপে চেপে বললেন জ্যোতিকে, আমার সঙ্গে একটু ওপরে চলুন।

এতক্ষণে বুঝল জ্যোতি, ইনিই তাহলে সেই সাহেব! এত সাহসী জ্যোতিরও ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। তবু সেটা বুঝতে না দিয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় বলল, আমি যেতে বাধ্য নই বোধহয়।

ওর সাহসে স্তম্ভিত হলেন মিঃ রাহা। দাঁতে চেপে বললেন, কিন্তু আপনাকে বাধ্য করতে পারি বোধহয়।

বুঝল জ্যোতি আপত্তি করে লাভ নেই। তপুদা এখনও অফিসেই আছে। বাড়ীর ঠিকানাটাও এদের অজানা নয়। পালানোর সব কটি পথ বন্ধ। বরং মাথা ঠিক রেখে সচেতন পদক্ষেপে এগোনই বুদ্ধিমানের কাজ।

জ্যোতি মাথা নিচু করে বলল, বেশ, চলুন।

মিঃ রাহারা ঘরে ঢোকা মাত্র পূর্ব নির্দেশ মত বেয়ারা এসে খবর দিল বড়বাবুকে, স্যার, সাহেব এসেছেন।

এলোমেলো কাগজপত্রগুলো কোন রকমে চাপা দিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন বড়বাবু। ফোনেই কিছু একটা গোলমালের আভাস পেয়েছিলেন তিনি। মিঃ রাহার ঘরে গিয়েই সংবাদ দিলেন তাই, স্বপনবাবু অফিসেই আছেন।

মিঃ রাহা গম্ভীর ভাবে বললেন, পাঠিয়ে দিন।

এতদিনে এবং এই প্রথম মাষ্টার মশায়কে কায়দা মত পেয়েছে তুষার। মনে মনে রাগে ফুঁসছিল ও। ওরই বাড়ীতে, ওরই ভাগ্নার, বিশেষ করে প্রিয়ার সান্নিধ্যে এতদিন এভাবে কাটিয়ে এল একটা ধাপ্পাবাজ। জ্যোতির দিকে তাকিয়ে তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞেস করল তুষার, তারপর, ছাত্রীদের পড়াশুনা কেমন চলছে স্বপনবাবু?

তুষারের দিকে ফিরে তাকাল জ্যোতি। ইঁদুর নিয়ে খেলবার কৌতুক তুষারের চোখে। চোখে চোখ রেখেই স্পষ্ট জবাব দিল জ্যোতি, অফিসের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর বেগার খেটে যেটুকু সম্ভব।

তুষাব ধমকে উঠল, সাট্ আপ্ ইউ চিট্! এখনও বাঁকা কথা বলার নেশা কাটেনি আপনার! আশ্চর্য!

জ্যোতি ম্লান হাসল, একটু বেকায়দায় পড়েছি, আপনি গালাগাল করতে পারেন।

মিঃ রাহা বাধা দিলেন, থাক তুষার, থাম।—তারপর জ্যোতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এর ফলাফল আপনি জানেন?

ম্লান মুখে বলল, জ্যোতি, আশঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু উপায় ছিলনা। রোজ তিলে তিলে যে শাস্তি ভোগ করছিলাম তার তুলনায় নতুন শাস্তিটা খুব বড় হবে না বোধহয়।

—সম্মানটা কোথায় থাকবে?

জ্যোতি গভীর স্বরে বলল, সমাজের সম্মানও এতে কমা উচিত। ভদ্রলোকের ছেলে যখন পকেটমার হয়ে যায় তখন শুধু সেই ছেলের সম্মানই নষ্ট হয় না, অভিভাবকেরও হয়।

ঘটনাটার বিন্দু-বিসর্গ টের পায়নি তপন। সাহেবের ঘরে ঢুকে জ্যোতিকে সামনে বসে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল তাই।

মিঃ রাহা চোখ তুলে তাকালেন।—আসুন।

জড়ান পায়ে এগিয়ে এল তপন। পা দুটো ওর অল্প অল্প কাঁপছে। জ্যোতির চেয়ারটা ধরে দাঁড়াল ও।

—আশা করি সবই বুঝছেন। আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

আস্তে মাথা নিচু করল তপন। তারপর স্তিমিত স্বরে টেনে টেনে বলল, বলবার আমার কিছু নেই স্যার। সত্যিই আমি প্রতারণা করেছিলাম। সত্যি স্বপন আমি নই। আমি তার দাদা, তপন গুপ্ত।

জ্যোতির দিকে আঙ্গুল তুললেন মিঃ রাহা, আর ইনি?

—আমাদের মামাতো ভাই।

তুষার প্রায় শিউরে উঠল, হরিবল্!

মিঃ রাহা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সত্যি স্বপন গুপ্তটি কোথায়?

করুণ দুটো চোখ তুলে তাকাল তপন। -দীর্ঘদিন ধরে রোগ শয্যায়। অর্থের অভাবে চিকিৎসা হচ্ছেনা, পথ্য দিতে পারছিনা। সব কথা শুনলে আমি জানি আপনি ক্ষমা করবেন আমাকে।

মিঃ রাহা নিরাসক্ত ভাবে বললেন, ওসব কাঁদুনি গাইবেন না। প্রতারণা প্রতারণাই, পেছনের ইতিহাসটা গৌণ। যাই হোক, আপনার কোয়ালিফিকেসন্টা?

তপন মাথা নিচু করল, মিথ্যে বলব না, নন-ম্যাট্রিক।

চমকে উঠলেন মিঃ রাহা।—হোয়াট্?

তপন চোখ তুলে বলল, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে তো আপনাকে আমি ঠকাইনি স্যার। আমার কাজে আপনারা সবাই খুশি ছিলেন। কাজের জন্যই রেখেছিলেন আমাকে, কাজ তো আমি পুরোই দিয়েছি স্যার।

চমকে উঠলেন মিঃ রাহা, কি কাজ দেখাচ্ছেন মশায়। অফিসের একটা ডিগ্‌নিটি নেই? চাইলাম গ্র্যাজুয়েট আর অফিস অলঙ্কৃত করলেন এসে একজন নন-ম্যাট্রিক! না না, এ ধরনের প্রতারণা কক্ষনও ক্ষমা করতে পারিনা আমি।

তপন এবার মিঃ রাহার হাত চেপে ধরল, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা

পর্যন্ত যদি আইনের চোখে ক্ষমার হয় তাহলে এটুকু অপরাধ কি ক্ষমা পেতে পারে না?

ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন মিঃ রাহা, প্রশ্নটা যখন আইনের তখন আইনকেই তার উত্তর দিতে দিন।

এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার ফোনের ওপরই মিঃ রাহার হাতের ওপর হাত রাখল জ্যোতি। স্থির স্বরে বলল, দাঁড়ান। আপনি শুধু ওর প্রতারণাটাই দেখছেন, কিন্তু অন্য দিকটা একবার ভেবে দেখেছেন? শক্তি, সামর্থ, কাজের উৎসাহ সমস্ত থাকা সত্বেও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নেই বলে যদি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে আপনার বাতিল হয়ে যেতে হত, চোখের সামনে গোটা সংসার না খেয়ে উপোস করত, এক মাত্র ছোট ভাই বিনা পথ্যে চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত—তাহলে আপনি কি করতেন?

মিঃ রাহা দৃঢ় স্বরে বললেন, এর জবাব আদালত দেবে। হাত ছাড়ুন।

হঠাৎ দরজার মুখে একটা উত্তেজিত স্বর শুনে ওরা সবাই ফিরে তাকাল।

—আরে বাবা পাক্কা এক মাইল প্রায় পিছে ছুটতে ছুটতে এসেছি আর তুমি বলছ ভুল? একটু আগেই দুজন এলেন। ছোকরা বাবুটির গায়ে ছাপ ছাপ বুশ শার্ট, চোখে কালো চশমা। চুল ওল্টান।

হঠাৎ মুখ শুকিয়ে গেল তুষারের। গলার স্বর শুনে জ্যোতিও একটু চমকে উঠল।

বেয়ারা বলল, ও, আপনি শালাবাবুর কথা বইলছেন?

উত্তেজিত স্বর, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই শালাবাবু কোথায়?

বেয়ারা নিয়মমাফিক স্বরে বলল, সিলিপ দিজিয়ে।

—আচমকা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল দীপেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই জ্যোতি আর তপনকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

—তোমরা এখানে?

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল তুষার। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আ-আমি তাহলে উঠি। ওদিকে আবার'—।

তুষারের দিকে ফিরে দৃপ্ত স্বরে বলল দীপেন, জীবনে অনেক-কেইতো বসিয়েছেন, আর একটু বসে যান না।

মিঃ রাহা বিরক্ত হলেন।—হু আর ইউ? আপনি এখানে কি চান?

দীপেন কপট বিনয়ে বলল, আমার বর্তমান পরিচয়ে ঠিক চিনবেন না স্যার! কিন্তু আমার বিগত পরিচয়ে হয়তো চিনতেও পারেন। ওঁর অধুনালুপ্ত ইণ্টার ন্যাশনাল ট্রেড্ ব্যুরোর আমি একজন প্রাক্তন অফিসার।

মিঃ রাহাও সামান্য বিব্রত হলেন।—তা এখানে কি? সে অফিস তো উঠে গেছে শুনেছি।

দীপেন একটু হাসল, ওঠানর জন্যই তো সে অফিস বসান হয়েছিল স্যার। কিন্তু মাঝখান থেকে আমাদেরও পথে বসিয়েছেন বলেই পই পই করে খুঁজছিলাম আপনাদের। আজ প্রায় আচমকাই পেয়ে গেলাম।

মিঃ রাহা বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাকে একটু বাইরে অপেক্ষা করতে রিকোয়েস্ট করছি। আমরা একটা অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত আছি।

জ্যোতি ও তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল দীপেনের। আজ সকালে জ্যোতির স্বপনকে খুঁজতে আসা ট্যাক্সীর মেয়েটির সঙ্গে স্বপনকে দেখা করতে না দিয়ে তাকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটার ভেতরও একটা গোলমালের আভাস পেয়েছিল দীপেন।

মিঃ রাহার দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল, যেতে পারি, কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন যে এই ব্যস্ততার সঙ্গে আমার এই বন্ধু দুটি জড়িত কিনা। এবং ব্যস্ততার কারণটা কি।

তুষার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, তপনবাবু স্বপনবাবুর সার্টিফিকেট দেখিয়ে নাম ভাড়িয়ে চাকরি করছিলেন এখানে।

দীপেন আকাশ থেকে পড়ল, সে কি!

মিঃ রাহার ঘটনার গতিটা ভাল লাগছিলনা। অফিসার-সুলভ গাম্ভীর্যে বললেন তিনি, দেখুন, এটা আউট্ এণ্ড আউট্ আমাদের অফিসিয়াল্ ব্যাপার। এ ব্যাপারে আপনার জড়িত না হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

দীপেন ফিরে তাকাল।—জীবনে সব সময় বাঞ্ছনীয় ঘটনাগুলোই কি ঘটে? আমাদের উঠে যাওয়া কোম্পানীর ইণ্টারভিউয়ের দিন আপনারও কি আমাদের সঙ্গে একটা অবাঞ্ছিত যোগাযোগ ঘটে যায় নি? আমার যতদূর মনে পড়েছে, আপনিই তো!

মিঃ রাহা থতমত খেয়ে গেলেন। তবু সামলে নিয়ে বললেন, দেখুন সেটা অন্য কেস্। তার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আইনের প্রশ্ন আছে সেখানে। আপনি ইচ্ছে হলে আইনের—।

দীপেন হাসল, অত বোকা নই আমি। আপনারা যে আইন বাঁচিয়েই সব করেন তা জানি। আদালত নয়, প্রয়োজন হলে আমাদের উঠে যাওয়া কোম্পানীর প্রাক্তন অফিসার দঙ্গলটি যোগাড় করে মাঝে মাঝে এখানেই দেখা করতে আসব তাহলে। আর কিছু না পারি দল বেঁধে দাঁড়িয়ে তারস্বরে আপনাদের ইতিহাস কীর্তন করতে পারব তো। আপনারা মানী লোক, সেটা কি খুব সম্মানজনক হবে আপনাদের পক্ষে?

মিঃ রাহা কিছুটা ভয় পেলেন। তবু শাসালেন, আপনি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?

এবার একটু এগিয়ে এল দীপেন। তারপর স্বর নামিয়ে গভীর সুরে বলল, ভয় দেখাচ্ছিনা, বরং একটা সন্ধির চেষ্টা করছি। দেখুন, ভূমিকা না করে খুলেই বলি। তপনদের ঘটনাটা এখনও কেউ জানেনা. আমরা কজন ছাড়া। আপনাদের হদিশও আমি ছাড়া কেউ এখনও পায়নি। আসুন না, ব্যাপারটা দুদিক থেকেই মিটিয়ে ফেলা যাক।

গভীর ভাবে কিছুক্ষণ ভাবলেন মিঃ রাহা। শালার দোষে বিরাট একটা ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন বুঝতে পারলেন। সত্যিই বোধহয়

এভাবে মিটমাট করা ছাড়া আর উপায় নেই। অন্তত আশু সমাধান কিছু খুঁজে পেলেন না।

কিছুক্ষণ ভেবে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, দেখুন, ভাববেন না যে আপনার কথায় ভয় পেয়ে বলছি। স্বপনবাবু, মানে তপনবাবুর ওপর আমি প্রথম থেকেই যথেষ্ট সিম্প্যাথেটিক। সে পক্ষপাতিত্বের কথা অবশ্য তপনবাবু জানেন। শুধু সেজন্যই এবারের মত একটা চান্স দিতে পারি তপনবাবুকে। কিন্তু আমি আশা করব, ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তপনবাবু নিজেকে শুধরে নেবেন।

তারপর তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এখানে বসেই একটা রেজিগ্‌নেশন লেটার লিখে দিন। আর সেক্‌সনে যাবেন না। এখান থেকেই কেটে পড়ুন আপনি।

তপন সেখানে বসেই রেজিগ্‌নেসন লেটার লিখে ফেলল। সেটা মিঃ রাহার হাতে দিয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

তপন, জ্যোতি ও দীপেন বেরিয়ে যেতেই শালার উপর রেগে ফেটে পড়লেন মিঃ রাহা।

—তোমার জন্যই, একমাত্র তোমার জন্যই আজ এরকম ফল্‌স পজিসনে পড়তে হল। ছি ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল তুষার। মিন মিন করে বলল, আচ্ছা, আমি চলি।

অদ্ভুত একটা আবছা চেতনা নিয়ে একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল তপন। অফিস, লোকজন, সামনের রাস্তা, যানবাহন—সব কিছু যেন একটা ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে দেখছে। মাথাটা হালকা লাগছে। একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিরাম ডাক বাজছে কানে। নিজেকে এত ক্লান্ত এত নিঃসঙ্গ মনে হয় নি ওর কোনদিন। এই মাত্র একটা স্বপ্ন দেখে যেন ওর ঘুম ভেঙেছে।

স্বপ্নটা এখনও চেতনা থেকে মিলিয়ে যায়নি। বাস্তব কিন্তু চেতনা থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয় নি। ভবিষ্যতের ভাবনা মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। অবসাদ গ্রস্তের মতো এগিয়ে চলল তপন।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে ওর সঙ্গে সঙ্গে নামছিল জ্যোতি ও দীপেন। যেন প্রচণ্ড ভারী একটা নৈস্তব্ধের শবাধার নিয়ে নামছে তিনজন। বারে বারে মনে হচ্ছিল জ্যোতির, কেউ কথা বলুক; কেউ কথা বললে সেই শব্দের সূত্র ধরে চেষ্টাকৃত উচ্ছলতায় হয় তো পুরো ঘটনাটাকে সহজ হালকা করে তুলতে পারে ও। কিন্তু কেউ কথা বলল না। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ান পর্যন্ত না।

—শুনুন, শুনছেন।

অনেক দূর থেকে কে যেন ডাকছে। তপনের মনে হল ফিকে ঘুমের ভেতর থেকে যেন শুনছে ডাকটা।

—এই যে, শুনে যান।

এবার ফিরে তাকাল তপন। মন্দিরা আসছে। মন্দিরা! কিছুটা চেতনা ফিরে পেল যেন তপন। নাম না জানা একটা ছোট্ট খুশির ছোঁয়া পেল। নির্জন একটা দ্বীপে মানুষের মুখ নিয়ে এল মন্দিরা। না চিনলেও, শব্দের সূত্র বলেই বোধহয় ওকে দেখে খুশি হল জ্যোতি। দীপেনের সঙ্গে চোখের ইশারা হল। একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

দীপেনের সামনে সে দাঁড়াল মন্দিরা। হাঁপাচ্ছে। একটু ম্লান হাসল দীপেন, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

উত্তরে মন্দিরা দৃঢ় দৃষ্টি তুলে তাকাল তপনের দিকে।—যা শুনছি তা সত্যি?

তপন চোখে চোখ রেখেই বলল, এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আমি জানি সব শুনলে আপনি অন্তত ভুল বুঝবেন না।

ঘৃণায় মুখ বাঁকাল মন্দিরা।—ছি ছি ছি, আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারিনি আপনি এতবড় প্রতারক, ঠগ।

এ যেন অপরিচিত কোন মন্দিরা। অবাক হল তপন। সামান্য ব্যথিতও।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তার কোন অমর্যাদা তো আমি করি নি কোনদিন।

—কিন্তু নিজের কি পরিচয় দিয়েছিলেন আমার কাছে?

—কিন্তু আপনিই একদিন বলেছিলেন, মানুষ হিসেবেই মানুষের দাম দেন আপনি, কোন ছাপ দেখে নয়.।

তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল মন্দিরা, নিজের প্রয়োজনে সে কথা আমার মুখ দিয়ে বের করে নিয়েছিলেন আপনি। ঠিক আছে, আপনার আসল পরিচয়টা একবার যাচাই করতে এসেছিলাম, জেনে গেলাম।

বলেই ঘুরে দাঁড়াল মন্দিরা।

—শুনুন। করুণ আর্তির মত শোনাল তপনের স্বর।

মন্দিরা ঘুরে দাঁড়াল,—শোনবার কিছুই নেই আর। আপনার সঙ্গে কথা বলতে রীতিমত ঘৃণা বোধ হচ্ছে আমার।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল মন্দিরা। স্থাণুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তপন। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে জ্যোতিদের কাছে এসে দাঁড়াল। চোখ না তুলেই আস্তে বলল, তোরা বাড়ী যা, আমি পরে আসছি।

জ্যোতি একটু জোর দিয়েই বলল, আমাদের সঙ্গেই চলনা তপুদা।

তপন ওব উৎকণ্ঠা টের পেল। একটু হেসে ওর কাঁধে হাত রাখল। বলল, ভয় নেই, আত্মহত্যা করব না। অতটা ভীরু ভাবছিস কেন আমাকে।

না আত্মহত্যা করবে না তপন। দূরে ভীড়ের ভেতর মিশে যাওয়া জ্যোতি আর দীপেনের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টি রেখে যেন নিজেকেই আবার শোনাল তপন, না, আত্মহত্যা ও করবে না।

অবশ্য কিছুক্ষণ আগেই ক্ষোভে, অপমানে, আত্মধিক্কৃত এক দুর্বল মুহূর্তে যে আত্মহত্যার কথা একবার মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কঠিন কর্তব্যের আকৃতি নিয়ে স্বপন, ইতু আর মার মুখ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একক মুক্তির এই ভীরু পথটার কল্পনা ওকে লজ্জিত করেছে।

একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঐ মুখ তিনটাই আবার মনে পড়ল তপনের। নিজের অজান্তেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এত অপমান, আত্মগ্লানি, শ্রম সবকিছুই বৃথা হল। কারো জন্যই কিছু করতে পারল না শেষ পর্যন্ত!

তবু, এত দুঃখের ভেতরও একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করল তপন। আত্মঘাতী অভিনয়ের পালাটা শেষ হল। মুখোসটার চাপে দিন দিন যেন পিশে যাচ্ছিল। অপরাধ বোধটা ক্রমেই পাথরের মত চেপে বসছিল। সেই শ্বাসরোধকারী অভিনয়টা থেকে অন্তত বাঁচা গেল।

সামনে পা বাড়াল তপন। বড় ক্লান্ত লাগছে, একটু বিশ্রাম দরকার। এই উর্ধ্বশ্বাস, গুমোট, যান্ত্রিক ব্যস্ততার বাইরে কিছুটা মুক্ত নিবিড় নিঃসঙ্গতা প্রয়োজন।

ভীড় ঠেলে ঠেলে ক্লান্ত পায়ে নির্জনতার আকাঙ্ক্ষার দিকে এগোতে লাগল তপন। আর এগোতে এগোতে হঠাৎ কেন যেন, বহুদিন পর, চিনুর মুখটা একবার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে মনে পড়ল তপনের।